# বিপন্ন ঈশ্বর

নটরাজন

অচ্যুত হালদার
কমলেশ বেরা
সুজিতকুমার ভট্টাচার্য
প্রীতিভাজনেষু

● লেখকের অন্যান্য বই ●

গিরিডিতে দেবেশ্বর

রস থেকে রসগোল্লা

ফার্স্ট প্রাইজ

স্বপ্নের মতো

খেলাঘরের রাজ্যে ( শিশুসাহিত্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত )

সব ছাড়িয়ে

সুন্দর দুর্গম

# সংসার

ছুপুর ফুরোবার আগেই অফিসে টেলিফোন এলো অমিতের।

অনেকটা সময় গল্প ক'রে শেষ পর্যন্ত অমিত বললো, 'তোর ছেলের ছবিগুলো নিয়ে বিকেলে যাচ্ছি।'

'কেমন হয়েছে ছবিগুলো?' হালকা গলায় সঙ্গে সঙ্গে শুধালো সুনন্দ।

একটু থেমে সকৌতুকে অমিত বললো, 'চমৎকার। আর কিছু বলবো না। তুই নিজেই দেখে বলবি।'

রিসিভারে মুখ রেখে একা একাই হাসলো সুনন্দ। বললো, 'আচ্ছা।'

'ছেড়ে দিচ্ছি এখন।' ব'লে টেলিফোন নামিয়ে রাখলো অমিত।

সুনন্দ টেলিফোনটা নামিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। ছবিগুলো দেখবার জন্য একটু বুঝি আগ্রহ হচ্ছে। সুনন্দ সেই আগ্রহটুকু ইচ্ছে ক'রেই এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলো।

গত রোববার ছবি তুলতে বাড়িতেই এসেছিলো অমিত। পাঞ্চালী একদিন অমিতকে বলেছিলো, 'খোকনের আজও ছবি তোলা হয়নি। আপনি একদিন তুলে যাবেন?'

অমিত সঙ্গে সঙ্গে রাজি হ'য়ে গিয়েছিলো। বলেছিলো, 'রোববার সকালে রেডি হ'য়ে থাকবেন, আসবো।'

রোববার সকালে সেজন্যেই এসেছিলো অমিত। নিজেকে এবং ছেলেকে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরী ক'রেই রেখেছিলো পাঞ্চালী। অমিতকে এসে আর অপেক্ষা করতে হয়নি। অল্পক্ষণের মধ্যেই নানাভাবে একরাশ ছবি তুলেছিলো তাদের তিনজনের।

সুনন্দ ভারি অস্বস্তি বোধ করেছিলো। ছু'মাসের একটা সজীব প্রায়-বোধহীন-অস্তিত্বকে নিয়ে হৈ-হৈ করাটাকে আশ্চর্য লেগেছিলো নিজের কাছেই।



গৌতম—১

মাত্র দু'মাস বয়স হয়েছে খোকনের। 'খোকন' নামটা রেখেছে পাঞ্চালীই। ভালো একটা নাম দেবার জন্য রোজ একবার ক'রে বলছে সুনন্দকে। সুনন্দ কানে নিচ্ছে না কিছু। একথা ব'লেই রোজ অভিযোগ করে পাঞ্চালী।

বিয়ে, সন্তান এবং সংসার নামে একটা আশ্চর্য জগত সুনন্দ নিজে তৈরী ক'রে ফেলবে একদিন, এ কথা সুনন্দ এখনও ভাবতে পারে না। সুনন্দর বন্ধুরাও ভাবতে পারেনি কোনদিন। ভাববার সুযোগ ছিলো না।

স্কুল জীবন থেকেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল সুনন্দ। জেলও খাটতে হয়েছিলো তার জন্য। তারপরই সমাজ এবং সংসারের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে শুরু করেছিলো আশ্চর্যভাবে। সুনন্দর নিজের বলতে কেউ বুঝি ছিলো না আর।

কলেজে ভর্তি হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি থেকে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বেছে নিয়েছিলো সুনন্দ। কলকাতায় চলে এসেছিলো। একা হ'য়ে গিয়েছিলো কলকাতায় পা রেখেই।

তারপর অজস্র ঘটনা দিনরাত্রির মতো অবলীলায় ঘটে গেছে।

বিয়ে ব্যাপারটাকে নিয়ে সুনন্দ ভাবেইনি। পাঞ্চালীর সঙ্গে যেদিন রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়েছিলো, সেদিন সংসার নামে একটা শব্দকে ভাবতেই পারেনি সুনন্দ। পাঞ্চালীকে ভালোবাসা, তার সঙ্গে একই আশ্রয়ে থাকা, এ নিয়ে একটা উত্তেজনা ছিলো সত্যিই। কিন্তু সেটাকে ভারি সহজ ক'রে নিতে পেরেছিলো সুনন্দ। সমস্ত কিছু দু'বছর সহজভাবে চলেছিলো। পাঞ্চালীর কোনো প্রত্যাশা কখনও চিন্তিত ক'রে তোলেনি সে দু'বছর।

পাঞ্চালী বরং বলতো, 'এই তো সুখ। যেমন খুশী থাকছি।'

বলতো, 'জানো, আমরা স্পোর্টসে 'এ্যাজ ইউ লাইকে' নেমেছি। আমাদের ট্র্যাক ধ'রে ছুটতে হচ্ছে না। কোনো নিয়ম কানুন নেই। কেউ ডিস্‌কোয়ালিফাইড্‌ও ক'রে দিতে পারবে না।'

সেই পাঞ্চালী কবে সংসারের দিকে ঘুরে গেলো, সুনন্দ তা খেয়ালই করতে পারে নি।

সুনন্দ কিন্তু এখনও দূরে স'রে আছে। রাত্রে খোকনের কান্না শুনলে চম্‌কে ওঠে। খোকনকে নিয়ে পাঞ্চালীর ব্যস্ততা তাকে কেমন যেন অবাক করে। খোকনের জন্য আলাদা কোনো ভাবনা সঞ্চয় ক'রে রাখে না সুনন্দ। রাখবার প্রয়োজন অনুভব করে না।

বরং সুনন্দ যেন ক্রমশঃ অদ্ভুত এক উদ্দেশ্যহীনতার দিকে চলে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে তা জানে না। সংসার শব্দটাই বুঝি সুনন্দর মধ্যে বিপরীত কোন স্রোত তৈরী ক'রে চলেছে।

রোববার অমিত যখন ছবি তুলতে এলো, তখনও ছবির মধ্যে নিজেকে ধ'রে রাখবার কথা ভাবেনি সুনন্দ। পাঞ্চালী খোকনকে নিয়ে তার খুশীমতো ছবি তুলুক, একথাই ভেবেছিলো মনে মনে।

কিন্তু অমিত এসে এমন জোর করতে থাকলো যে শেষ পর্যন্ত খোকন এবং পাঞ্চালীকে নিয়ে ছবি তুলতেই হয়েছিলো। একখানা ছবিই অবশ্য তুলেছিলো সুনন্দ।

এখন অমিতের টেলিফোনের পর ছবিখানা দেখবার জন্য সত্যিই একটুখানি আগ্রহ হচ্ছে। কাজে মন দিতে চেষ্টা ক'রেও সুনন্দ ঠিক যেন মন দিতে পারছে না।

নিঃশব্দে সিগারেটটা টানতেই থাকলো সুনন্দ।

একটু তাড়াতাড়িই সুনন্দ বাড়িতে ফিরে এলো।

পাঞ্চালী ছেলেকে সাজাচ্ছিলো। সুনন্দকে দেখেই অবাক হ'য়ে বললো, 'একী, আজ এতো তাড়াতাড়ি!'

'তাড়াতাড়ি হ'য়ে গেলো, ভাবলুম বাড়িতে যাই—' সুনন্দ ইচ্ছে ক'রেই একটু ঘুরিয়ে বললো। ছবির কথা বলতে ভারি অস্বস্তি বোধ করছে সুনন্দ।

পাঞ্চালী বুঝি খুশী হলো। বললো, 'কদ্দিন পর তাড়াতাড়ি

এলে জানো ?'

হাসলো সুনন্দ। জিজ্ঞেস করলো, 'কদ্দিন পর ?'

'প্রায় দেড়মাস।'

'তুমি সব হিসেব ক'রে রাখছো নাকি ?'

'রাখতে হচ্ছে এখন। বেঁচে থাকতে হ'লে একটা হিসেব রাখতেই হয়। তার বাইরে গেলেই পতন এবং মৃত্যু।'

কথাটা ব'লে লঘুস্বরে হেসে উঠলো পাঞ্চালী।

হাসতে হাসতেই পাঞ্চালী হীটার জ্বালালো। চায়ের ছোট্ট কেটলিটা চাপিয়ে দিলো তার ওপর। মেপে জল দিলো তার মধ্যে।

সব হিসেব ক'রে করা। সুনন্দ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। অস্বস্তিবোধ করলো ভেতরে ভেতরে।

খোকন হাত পা নেড়ে খেলা করছে ছোট্ট দোলনায়। বেবী পাউডারের গন্ধ খোকনের শরীর থেকেই ভেসে আসছে।

'সংসার' শব্দটাকে ফের গভীরভাবে ভাবলো সুনন্দ। মনের ভেতর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখলো।

অমিত সংসারটাকে তার ক্যামেরায় তোলা ছবির ভেতর সাজিয়ে নিয়ে আসছে একটু পরেই।

ছবিতে নিজের সংসারকে দেখতে কেমন লাগবে ?

পাঞ্চালী কাছে এসে বসলো। বললো, 'সত্যি, তুমি হঠাৎ আজ তাড়াতাড়ি এলে কেন বলোতো ?'

সুনন্দ হেসে বললো, 'এরপর থেকে দেরী ক'রেই ফিরবো। তুমিও কোনো প্রশ্ন করবে না।'

গম্ভীর হলো পাঞ্চালী। বললো 'ঠিক আছে, আর কখনও তোমায় কোনো প্রশ্ন করবো না।'

'তোমাকে এখন খোকনের মা ব'লেই মনে হচ্ছে কিন্তু।' পাঞ্চালীকে একটুখানি ছুঁয়ে বললো সুনন্দ।

খোকন অদ্ভুত একটা শব্দ করছে গলায়। চোখের দু'টো তারা

মাছের মতো খেলা করছে চোখের ভেতর। কি দেখতে চায় খোকন?

পাঞ্চালী ইচ্ছে ক'রেই বুঝি দুষ্টুমী ক'রে বললো, 'খোকন দেখতে পাচ্ছে কিন্তু।'

চকিতে একবার খোকনকে দেখে পাঞ্চালীর দিকে তাকালো সুনন্দ।

এখুনি কলিংবেল বেজে ওঠা উচিত। হৈ হৈ ক'রে এসে পড়া উচিত অমিতের। কথাটা ভেবে একবার দরজার দিকে তাকালো সুনন্দ।

পাঞ্চালী জল ফুটে উঠবার শব্দে উঠে পড়লো।

চা তৈরী করতে বেশী সময় লাগলো না পাঞ্চালীর। এগিয়ে এসে কাপটা সুনন্দর হাতে দিয়ে ব'সে প'ড়ে বললো, 'আচ্ছা, তোমার বন্ধু সেই যে ছবি তুলেছিলো, সে ছবিগুলো সে নিয়ে আসবে না?'

চায়ে চুমুক দিয়ে সুনন্দ পাঞ্চালীর চোখে চোখ রেখে বললো, 'আজ এখুনি আসবার কথা অমিতের।'

'আজ? এখুনি?' ব'লে খুশীতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো পাঞ্চালী। তারপর হঠাৎ ঝুঁকে প'ড়ে বললো, 'সে জন্যই তুমি বুঝি তাড়াতাড়ি চলে এসেছো?'

'নাহ'লে এতো তাড়াতাড়ি আমি বাড়িতে ফিরে আসি?' রহস্যময় চোখে হেসে বললো সুনন্দ।

পাঞ্চালী সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো। বললো, 'তুমি একটু খোকনকে ছাখো, আমি আসছি।'

ব'লেই পাশের ঘরে চলে গেলো পাঞ্চালী।

খোকন হাত-পা নাড়াচ্ছে। সুনন্দ খোকনকে দেখতে থাকলো। অমিত খোকনের ছবি নিয়ে আসবে। শুধু খোকনের নয়, তাদের সংসারের ছবি।

ফের সংসার শব্দটাকে নিয়ে ভাবলো সুনন্দ। মনের ভেতর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখলো।

সংসার শব্দটা যে তার সঙ্গেও যুক্ত হবে, একথা কখনও ভাবতে পারেনি সুনন্দ। অথচ সুনন্দ ছোটোখাটো একটা সংসারের কর্তা এখন। নিজের চেহারাটা নিজেই একবার চোখ বুঁজে দেখে নিলো।

কিন্তু কিছুতেই নিজেকে একাকার করতে পারছে না সংসার শব্দটার সঙ্গে।

খোকন শব্দ করছে কি ? হ্যাঁ, শব্দ করছে খোকন।

পাঞ্চালী ঘরে ঢুকলো। একটুখানি সেজেছে পাঞ্চালী। শাড়িটাও পাল্‌টে নিয়েছে। এই-ই নিয়ম। সংসারের নিয়ম। পাঞ্চালী সেই নিয়মের বাইরে যাবে কি ক'রে ? চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কথাটা ভাবলো সুনন্দ।

অফিসের পোষাকটা পাল্‌টাতে হবে এবার। সুনন্দ উঠে পড়লো। অমিত আসবে, গভীর রাতের আগে ফিরবে না। সুতরাং আপিসের পোষাক ছেড়ে খানিকটা স্বচ্ছন্দভাবে বসতে হবে।

খোকনের দিকে একবার তাকিয়ে সুনন্দ পাশের ঘরে এলো।

নতুন কেনা দেয়াল ঘড়িটায় চমৎকার শব্দে সাতটা বাজলো। কিন্তু অমিত এলো না।

পাঞ্চালী সুনন্দর পাশে এসে বসেছে খানিক আগে। খোকনকে কোলের ওপর সাজিয়ে রেখেছে। আলোর দিকে তাকিয়ে খোকন কিছু শব্দ করতে চেষ্টা করছে বুঝি। অমিতের জন্য অধৈর্যভাবে সময় কাটাতে হচ্ছে ব'লে খোকনের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক হ'তে চেষ্টা করছে সুনন্দ।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে পাঞ্চালী বললো, 'কি হলো, তোমার অমিত আসবে না নাকি ?'

সুনন্দ বললো, 'টেলিফোন করেছে আমাকে। নিশ্চয়ই আসবে।'

'মনে হচ্ছে আটকে পড়েছে কোথাও।' পাঞ্চালী বললো।

অধৈর্য গলায় সুনন্দ বললো,'কিন্তু কোথাও আটকে পড়বার ছেলে নয় অমিত!'

উঠে দাঁড়ালো পাঞ্চালী। বললো, 'তুমি একটু ওকে নিয়ে বোসো। আমি আসছি একটু।' ব'লে খোকনকে কোলে তুলে দিয়ে পাঞ্চালী চলে গেলো ভেতরে।

সুনন্দ পাঞ্চালীকে কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না।

সুনন্দর হাতের ওপর একটা টার্কিশ টাওয়েলে খোকনের পালকের মতো হাল্‌কা শরীর। একটানা হাত পা নাড়িয়ে যাচ্ছে খোকন। হাতের ওপর এমনিভাবে খোকনকে নিয়ে কি সুনন্দ বসেছে কোনোদিন?

না, বসেনি। খোকনের জন্মের পর থেকেই পাঞ্চালী পাশের ঘরে তার জায়গা ক'রে নিয়েছে। হঠাৎ কখনও পাশের ঘরে যায় সুনন্দ। মুহূর্তের জন্য হয়তো খোকনকে দেখে। ওইটুকুই। কোলে তুলবার কথা কখনও ভাবে নি।

খোকন হাত পা নেড়েই যাচ্ছে সুনন্দর হাতের ওপর। অদ্ভুত একটা অনুভূতি সুনন্দর রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠতে থাকলো সুনন্দর সমস্ত শরীর।

সুনন্দ খোকনের মুখের দিকে তাকালো। ছ'চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে উঠছে আলো। মোমের মতো শরীর যেন তার কোনো এক রহস্যময় স্বপ্নের ভেতর থেকে উঠে এসেছে। কোন্ অস্ফুট ভাষায় মুখর হ'য়ে উঠেছে গোলাপের মতো ছ'টো ঠোঁট!

খোকনের দিকে মুখ নামালো সুনন্দ। চেনা অচেনায় মেশা মৃদু সুগন্ধ খোকনের সমস্ত শরীরে। দীর্ঘ ক'রে নিঃশ্বাস টেনে সুনন্দ সেই গন্ধটুকু বুকের ভেতর নিলো। আবেগে উত্তেজনায় সমস্ত শরীর বুঝি থর্‌থর্ ক'রে কাঁপছে। চোখ বুঁজলো সুনন্দ।

হঠাৎ ঠিক সেই মুহূর্তেই পাঞ্চালীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে চম্‌কে উঠলো সুনন্দ, 'তোমাদের ছ'জনকে চমৎকার দেখাচ্ছে সত্যি!'

সুনন্দ চোখ মেলে দেখলো পাঞ্চালীকে। পাঞ্চালীর চোখে রমণীয় কৌতুক। তীব্র একটা সুখ সুনন্দকে বিপন্ন করলো মুহূর্তে।

পাঞ্চালী ফের বললো, 'আমি ভাবতেই পারছি না দৃশ্যটা। আমার একটা ক্যামেরা থাকলে ঠিক ছবি তুলে রাখতাম।'

অমিতের মুখ, তার ক্যামেরা, ফ্ল্যাশের ঝিলিক সুনন্দর চোখে ভেসে উঠলো।

কি ছবি তুলেছে অমিত? তার এই এই মুহূর্তের অনুভব অমিতের ক্যামেরা ধরবে কি ক'রে? অমিতের তোলা ছবিগুলো বুঝি ঠিক নয়।

সে জন্যেই কি ঠিক অমিত আসতে চেয়েও আসতে পারলো না?

পাঞ্চালী আরো কাছে এলো। খুব কাছে। তার মুখ নামালো খোকনের মুখের ওপর। দুর্লভ হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠা দু'টো ঠোঁট খোকনের গাল ছুঁলো। আশ্চর্য সুন্দর একটা শব্দ হলো সঙ্গে সঙ্গে। পৃথিবীর সমস্ত শব্দের মধ্যে পবিত্রতম সেই শব্দ।

সুনন্দ ফের মুহূর্তের জন্য চোখ বুঁজলো। তারপর সেই শব্দের রেশ ধ'রে রমীণয় এক সমুদ্রের তরঙ্গের দোলায় সংসার নামে এক আশ্চর্য জগতের মধ্যে অবলীলায় পৌঁছে গেলো।

বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই ছুটন্ত পায়ের শব্দে অমল বুঝতে পারলো, দরজা খুলে দেবার জন্য ভেতরের বারান্দা থেকে ছুটতে ছুটতে আসছে শীলা।

ঠিক এখন, শেষ বিকেলের ছায়া নামবার সময়, শীলা কিন্তু ভেতরের বারান্দায় থাকে না। মনে মনে কথাটা ভেবে বিস্মিত অমল দরজার ওপর হাত রাখলো।

ঠিক তখুনি শীলা দরজা খুললো।

ভেতরের বারান্দা থেকে ছুটে আসবার জন্য একটুখানি হাঁপাচ্ছে শীলা। বুঝতে পারলো অমল।

'ভেতরের বারান্দা থেকে নিশ্চয়ই ছুটে এলে?' অমল শুধালো।

শীলা হাসলো। বললো, 'হুঁ।'

ব'লে হঠাৎ ঝুঁকে পড়লো শীলা। দু'চোখে খুশীর পাখী উড়িয়ে বললো, 'একটা অদ্ভুত জিনিস কিনেছি। দেখলে অবাক হ'য়ে যাবে—'

নিশ্চয়ই তারই জন্য ভেতরের বারান্দায় ছিলো শীলা। কথাটা ভেবে অমল শীলার চোখে চোখ রেখে বললো, 'কিন্তু অদ্ভুত জিনিসটা কি?'

'শিগ্‌গীর চলো, দেখবে—'

ব'লে একরকম ছুটিয়েই অমলকে ভেতরের বারান্দায় নিয়ে এলো শীলা।

ভেতরের বারান্দায় এসেই অবাক হ'য়ে অমল দেখলো, বারান্দার তারের সঙ্গে একটা খাঁচা ঝুলছে। আর খাঁচার মধ্যে একটা ময়না।

'সে কী, কখন কিনেছো?' অমল অবাক হ'য়ে শুধালো। পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো খাঁচাটার কাছে।

শীলা খাঁচার পাশে দাঁড়িয়ে হেসে বললো, 'তুপুরবেলায়। খাঁচাটা সুদ্ধ কিনেছি।'

অমল ময়নাটার দিকে তাকালো। অমলকে দেখে ন'ড়ে চ'ড়ে খাঁচার এক কোনায় গিয়ে বসলো ময়নাটা। তারপর স্থিরভাবে তাকিয়েই রইলো অমলের দিকে। বুঝি সতর্ক হ'য়ে উঠেছে ময়নাটা।

শীলার সঙ্গে নিশ্চয়ই এতোক্ষণে চেনাজানা হ'য়ে গেছে।

ছেলেবেলায় পাখী পুষবার দারুণ সখ ছিলো অমলের। অনেক শালিক চড়ুই তাদের বাড়ির সেই পুরোনো খাঁচার মধ্যে দিন কাটিয়ে গেছে।

সে সব দিনের ছবি মুহূর্তে ভেসে উঠলো অমলের চোখে।

নির্নিমেষে অমল ময়নাটাকে দেখতে থাকলো।

হঠাৎ শীলা বললো, 'মজার ব্যাপার কি জানো, ময়নাটা সারাদিন তু'টো কথাই শুধু বলেছে। একটা কথা হলো, 'হরিবোল', আরেকটা 'সত্য বলো'।'

'ময়নাটাকে বোধহয় ওই তু'টো কথাই শিখিয়েছে পাখীঅলা।' সঙ্গে সঙ্গে অমল বললো।

হাসলো শীলা। বললো, 'তু'টো কথাই বিচ্ছিরি। নতুন কথা শেখাতে হবে ময়নাটাকে। কাল থেকেই শেখাবো।'

শীলার কথা শেষ হ'তেই তীক্ষ্ণস্বরে ময়নাটা চেঁচিয়ে উঠলো, 'হরিবোল।'

শীলার দিকে ফিরে অমল বললো, 'মনে হচ্ছে অনেক দিন কথা শিখেছে। তোমার আর কষ্ট হবে না কথা শেখাতে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।' শীলা বললো।

'ভালোই হলো, কথা শেখাতে আমাদের বেশী পরিশ্রম করতে হবে না।' অমল বললো।

'তাহ'লে বলো, ময়নাটা কিনে ভালোই করেছি।'

'ভালোই করেছো।' ব'লে শীলার দিকে তাকিয়ে একটুখানি

হেসে অমল অফিসের পোষাক খুলতে থাকলো।

শীলা হাত বাড়িয়ে হঠাৎ খাঁচাটাকে একটুখানি দুলিয়ে দিয়ে চ'লে গেলো রান্নাঘরের দিকে।

অমল জানে, শীলা এখন স্টোভ জ্বালিয়ে তার ওপর চায়ের জল চাপিয়ে দেবে। এখনও চুল বাঁধেনি শীলা। ময়নাটার জন্যই বোধ হয় সময় পায়নি। কাজেই আজ সন্ধ্যের পর চুল বাঁধবার সময় হবে শীলার। কারণ, যতোটুকু বিকেল এখনও আকাশ ছুঁয়ে আছে, সবটুকু ফুরিয়ে যাবে অমলের জন্যই।

ময়নাটা হঠাৎ তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'সত্য বলো।'

অমল ময়নাটার দিকে তাকালো। তারপর হেসে বললো, 'চেষ্টা করছি।'

অমল রান্নাঘরের দিকে ফিরে শীলাকে বললো, 'ব্যাপারটা বেশ ভালোই হলো। সত্যি কথা বলিয়ে নেবে ময়নাটা।'

শীলাও হাসতে হাসতে বললো, 'মিথ্যে-টিথ্যে বলো নাকি আজকাল?'

'তোমার কাছে অবশ্য বলবার সাহস নেই—' সঙ্গে সঙ্গে বললো অমল।

শীলা হাসলো। দু'চোখে তার কৌতুক নেচে উঠেছে।

অমল ফিরে তাকালো খাঁচাটার দিকে।

ময়নাটা তার খাঁচার মধ্যে আড়াআড়ি ক'রে বসানো একটা দাঁড়ের ওপরে ব'সে আছে। সামনে খাবারের বাটিদু'টো। কিছু খাবার দিয়েছে শীলা। কিছু খেয়েছে, কিছু ছিটিয়েছে। অবশ্য ছিটিয়েছেই বেশী।

অমল খাঁচাটার কাছেই দাঁড়িয়েই রইলো। শেষ বিকেলের ছায়ায় ময়নাটার দিকে তাকালো ভালো ক'রে! সমস্ত শরীরে তার অযত্নের চিহ্ন। পথে পথে পাখীঅলার খাঁচায় কতো জায়গা ঘুরেছে কে জানে। কে তাকে শীলার মতো যত্ন করবে? দু'টো নীতি

বাক্য তাকে শুধু আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। সে দু'টোই ব'য়ে বেড়াচ্ছে। কথাটা মনে হ'তেই আশ্চর্য হ'য়ে অমল ভাবলো, পাখীঅলা যেন দু'টো নীতিবাক্য বিক্রি ক'রে গেছে শীলার কাছে। মনে মনেই হাসলো অমল। শীলা এলো চা নিয়ে।

অমল চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বললো, 'তুমি কিন্তু দু'টো নীতিবাক্য কিনেছো। ঠিক ময়না কিনেছো বললে ভুল বলা হবে।'

শীলা বললো, 'তা-ই। নীতিবাক্যগুলো সহজে পাই ব'লে গ্রাহ্য করি না। এবার টাকা খরচ ক'রে কিনেছি ব'লে ঠিক গ্রাহ্য করবো।'

একটু থেমে ফের বললো, 'দ্যাখো, আমরা যখন সত্যি কথাটাকে লুকিয়ে কিছু বলি তখন ভেতরে ভেতরে আড়াল ক'রে রাখি নিজেকেই। ময়নাটা এবার আর নিজেকে আড়াল ক'রে রাখতে দেবে না। সত্যি বলো ব'লে সত্যি কথাটা বলিয়ে নেবে।'

শীলার দিকে তাকিয়ে অমল বললো, 'ব্যাপারটা কিন্তু ভয়েরই হলো শীলা।'

হাসলো শীলা। চুল বাঁধবার জন্য উঠে চলে গেলো ভেতরে।

ময়নাটা চেঁচিয়ে বললো, 'হরিবোল।'

অমল বললো, 'কথাটা তোমায় বললো, না আমায়।'

'দু'জনকেই বলছে।'

কথাটা বলতে বলতেই শীলা চিরুণী, চুলের কাঁটা আর ফিতে নিয়ে একটা মোড়ায় এসে বসলো।

অমলের ভারি ভালো লাগছে। শীলার চুল থেকে শেষ বিকেলের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে হাল্‌কা বাতাসে। ময়নাটা নড়ছে চড়ছে খাঁচার ভেতর।

সুখী মানুষের মতো একটা সিগারেট ধরিয়ে শীলার পাশেই আরেকটা মোড়ার ওপর ব'সে নিবিড়ভাবে শীলার চুল বাঁধা দেখতে থাকলো অমল।

দু'টো দিন খাঁচার ভেতর দিব্যি ফুরিয়ে ফেললো শীলার ময়না।

কিন্তু মনে মনে ভারি বিরক্ত শীলা। ময়নাটা নতুন কথা শিখতে চাচ্ছে না। সেই দু'টো কথাই বলে যাচ্ছে সারাদিন।

কথাটা অমলকে বলতেই অমল হেসে বললো, 'তুমি শেখাতে পারছো না তাহ'লে।'

ক্ষুব্ধ গলায় শীলা বললো, 'তাহ'লে তুমি শেখাও।'

অমল এক মুহূর্তে ভেবে বললো, 'কাল ওর মুখে নতুন কথা শুনবে, দেখে নিও।'

ব'লে খাঁচাটার পাশে এলো অমল। হাতঘড়ি দেখলো, আপিসে যাবার জন্য এক ঘণ্টা পরে উঠলেও চলবে। এই এক ঘণ্টা অমল ময়নাটাকে একটা নতুন কথা শেখাবার জন্য চেষ্টা করতে পারে নিশ্চয়ই।

গতকাল থেকে সেই দু'টো কথাই বলে চলেছে ময়নাটা। সেই দু'টো নীতিবাক্য। ময়নাটাকে অত্যন্ত সৎ আর সরল ব'লে মনে হচ্ছে এখন। অমল খাঁচার খুব কাছে আসতেই স'রে বসলো ময়নাটা। তারপর অমলের দিকে তাকিয়ে রইলো।

শীলার কাছে কোনো কথা শেখেনি ময়নাটা। অবশ্য এতো তাড়াতাড়ি শিখতেও পারে না। আরো দু'চার দিন সময় গেলে নতুন কথা হয়তো শিখবে। কিন্তু শীলার বুঝি অতো ধৈর্য নেই।

অমল অন্ততঃ একটা নতুন কথা শেখাবেই।

একটু মজা করবার জন্যই ময়নাটাকে শীলার নামটা শেখাতে চেষ্টা করলো অমল। খাঁচার খুব কাছে মুখ নিয়ে স্পষ্ট ক'রে বারবার শীলার নামটা বলতে থাকলো। কান পেতে শীলার নাম শুনতে থাকলো ময়নাটা। কাঁচের পুঁতির মতো স্থির হ'য়ে রইলো চোখ।

শীলা পাশে এসে দাঁড়ালো। বললো, 'শেষ পর্যন্ত আমার নামটাই শেখাচ্ছো?'

'এক সময় আমি শিখেছি, এবার না হয় তোমার ময়নাটাই শিখুক।' গম্ভীর গলায় বললো অমল।

শীলা কিছু না ব'লে হাসলো।

স্নানের জন্য জামা খুলতে খুলতে স্নানঘরের দিকে পা বাড়ালো অমল। একবার ময়নাটাকে পেছন ফিরে দেখলো।

ময়নাটা বোধহয় অমলের কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো। অমলকে ফিরে তাকাতে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলো, 'সত্য বলো।'

শীলা রহস্য ক'রে সে কথাটার প্রতিধ্বনি করলো, 'সত্য বলো।'

অমল শীলার দিকে সকৌতুকে একবার তাকিয়ে পা বাড়ালো স্নানঘরের দিকে। অনেক দেরী হ'য়ে গেছে। এখন আর কোনো রকমেই কথা বাড়ানো যেতে পারে না।

বিকেলে অফিস থেকে ফিরে এসেই অমল খাঁচাটার সামনে এলো। ঝুঁকে পড়ে ময়নাটাকে একটানা শোনাতে থাকলো শীলার নাম। ময়নাটা খানিকখন কান পেতে শুনলো সব। তারপর হঠাৎ খানিকটা স'রে ব'সে ক্রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'হরিবোল'।

অমল খানিকটা অধৈর্যভাবে বললো, 'আমি হরিবোল শুনতে চাই না, যা শেখাচ্ছি তাই শুনতে চাই।'

কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলো শীলা। অমলের দিকে একটুখানি ঝুঁকে প'ড়ে বললো, 'ওর মালিক ওকে যা শিখিয়েছে তার বাইরে ও আর শিখবেই না কিছু।'

অমল বললো, 'অসম্ভব বেয়াড়া পাখী যা হোক। সরল ভেবে ভুল করেছি।'

অমলের কথায় শীলা হেসে ফেললো। বললো, 'আমিও খুব খেটেছি দু'দিন। বেয়াড়া ব'লেই চুপ ক'রে শুনে শেষ পর্যন্ত সেই কথা দু'টোই বলছে।'

খানিকটা ভেবে অমল শীলার দিকে ফিরে বললো, 'ওর মালিকের চেহারাটা কেমন বলোতো?'

শীলা একটু সময় ভাবলো। বোধহয় মনে করলো চেহারাটা।

তারপর বললো, 'তেমন বর্ণনা করবার মতো কিছু নয়। রোগা আর লম্বা। মুখে একরাশ কাঁচা আর পাকা দাড়ি। পোষাক-টোষাক খানিকটা ফকিরদের মতো। লোকটাকে কিন্তু খুব বিপন্ন মনে হচ্ছিলো।'

অমল ময়নাটার দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে শীলার কথা শুনলো। তারপর ক্রমশঃ গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। একটা অদ্ভুত কথা অকারণেই অমলের মনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে এই মুহূর্তে। মৃদু গলায় অমল বললো, 'সেই লোকটাই কিন্তু ঈশ্বর।'

শীলা অবাক হ'য়ে বললো, 'সেই লোকটাকে তোমার হঠাৎ ঈশ্বর মনে হলো কেন বলোতো !'

'ঈশ্বর দেখতে নিশ্চয়ই ওই রকম।' তেমনিভাবেই বললো অমল।

উঁচুগলায় হেসে উঠলো শীলা। হাসি থামিয়ে বললো, 'তুমি ঈশ্বরকে দেখেছো নাকি !'

অমল বললো, 'উঁহু ! তবে স্পষ্টই জানি, ঈশ্বর নিজে মানুষকে নিয়ে ভারি বিপন্ন। সেজন্যেই নীতিবাক্য শিখিয়ে পাখী বিক্রি ক'রে বেড়াচ্ছেন মানুষের কাছে। পাখীঅলা ঈশ্বরকে তাই তোমার বিপন্ন মনে হচ্ছিলো।'

শীলা এবার আর হাসলো না। হাসতে পারলো না সম্ভবতঃ।

অমল দেখলো, শীলার চোখে আনন্দ আর বিস্ময় মাখামাখি হ'য়ে আছে। পাখীঅলাই যে ঈশ্বর, সে কথাটা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছে শীলা।

শীলার ঈষৎ বিস্ফারিত ঠোঁটদু'টো কেঁপে উঠছে আশ্চর্যভাবে।

ময়নাটার দিকে তাকালো শীলা। ময়নাটা মাথা কাত ক'রে খাঁচার এক কোনায় স্থির হ'য়ে ব'সে আছে।

'ঈশ্বরের পাখীকে আমাদের কথা শেখাবার সাধ্য নেই শীলা।' অমল বললো ফের।

'পারতুম শেখাতে, যদি আমাদের প্রথম পুরুষ জ্ঞানবৃক্ষের ফল না

খেতেন!' শীলা বললো সঙ্গে সঙ্গে।

সহজ হ'তে চেষ্টা করলো শীলা। অমল বুঝতে পারলো।

একটু সময় ভাবলো অমল। তারপর লঘুস্বরে বললো, 'কী মজার কাণ্ড ত্যাখো, সে ফলের স্বাদ পেলুম না অথচ তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের।'

শীলা হাসলো অমলের কথায়। কিন্তু তবু শীলাকে খানিকটা চিন্তিত মনে হলো অমলের। পাখীঅলা ঈশ্বরের কথা বুঝি তাকে বিপুলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে গেছে।

ময়নাটা ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে গলা বাড়িয়ে বললো, 'হরিবোল।'

অদ্ভুতভাবে চম্‌কে উঠলো শীলা। ঝুঁকে পড়লো খাঁচার ওপর।

অমল ময়নাটার দিকে তাকালো। ময়নাটা তার দিকেই গভীর ভাবে যেন তাকিয়ে আছে। ফের ময়নাটাকে ঈশ্বরের পাখী ভেবে অমল নিজেই খানিকটা রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলো।

শেষরাত্রে হঠাৎ কেন জানি ঘুম ভেঙে গেলো অমলের।

সঙ্গে সঙ্গে অমল শুনতে পেলো ময়নাটা মন্ত্রের মতো সেই তু'টো নীতিবাক্য ব'লে চলেছে। সন্ধ্যের পর ঘরের এক কোনায় খাঁচাটাকে এনে ঝুলিয়ে রেখেছিলো শীলা। ভেতরে খোলা বারান্দায় ময়নাটাকে রাখতে ভরসা পায়নি। বেড়াল-টেড়াজের ভয় তো আছেই—সেই সঙ্গে নিজের তৈরী কিছু ভয়ও আছে শীলার।

অমল খানিকটা কাত হ'য়ে শুয়ে খাঁচাটার দিকে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় লাফিয়ে উঠলো বিস্ময়ে।

ঘরের ভেতরের কম পাওয়ারের বাল্বের কুয়াশার মতো অস্বচ্ছ আলোয় খাঁচার পাশে একটা অস্পষ্ট চেহারা দেখতে পাচ্ছে অমল। সেই পাখীঅলার চেহারা। শীলা যেমন বর্ণনা দিয়েছিলো হুবহু তেমনি। বিপন্ন ঈশ্বর ব'লে তাকে স্পষ্টই চিনতে পারলো অমল। তিনি যেন লুকিয়ে লুকিয়ে দ্রুত ময়নাটাকে নীতিবাক্য তু'টো মুখস্থ

করিয়ে দিচ্ছেন।

অমল মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলো পাখী অলা ঈশ্বরের দিকে। শুনতে পেলো, ময়নাটা ক্রমাগতই ঈশ্বরের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে ঈশ্বরের সেই কথা দু'টো ব'লে যাচ্ছে। একাকার হ'য়ে গেছে দু'জনের কণ্ঠস্বর।

ঈশ্বরের জন্য করুণায় অমল ভেঙে টুকরো টুকরো হ'তে থাকলো ক্রমশঃ। অসম্ভব বেদনায় অসহায় ঈশ্বর এখন পাখী অলা। বেদনার্ত অমলের মনে হলো, ঈশ্বরের জন্য কয়েক ফোঁটা জল তার গাল বেয়ে ঝ'রে পড়ছে। অমল তা মুছলো না।

নিশ্চয়ই শীলাকে এই মুহূর্তে ডেকে তোলা উচিত। অমলের মনে হলো। এমনিভাবে ঈশ্বরকে দেখবার সুযোগ আর কখনোই হয়তো পাওয়া যাবে না।

আশ্চর্য একটা উত্তেজনা অনুভব করলো অমল। শীলার দিকে ফিরলো। গভীর ঘুমে ডুবে আছে শীলা।

আস্তে আস্তে ঠেলে শীলার ঘুম ভাঙালো অমল। ঘুম ভাঙতেই মুখের ওপর ঝুঁকে পড়া অমলের মুখ দেখতে পেয়ে বুঝি বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠলো শীলা।

বিস্মিত শীলাকে ভাঙাগলায় অমল বললো, 'খাঁচার পাশে তোমার সেই পাখীঅলাকে দেখতে পাচ্ছো ?'

শীলা প্রবলভাবে চম্‌কে উঠে তার হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে বার কয়েক তার চোখ ঘসলো। তীক্ষ্ণ চোখে খাঁচাটাকে লক্ষ্য করলো। তারপর বললো 'উহুঁ।'

অমল শীলার দিকে তাকিয়ে বিপন্নভাবে বললো, 'আমি দেখতে পাচ্ছি। পাখীটাকে কথা দু'টো শিখিয়ে যাচ্ছে সে।'

শীলা এবার ঝুঁকে পড়লো অমলের মুখের ওপর। অমলের একখানা হাত ধ'রে ফেললো মুঠোয়।

অসম্ভব ভয় পেয়েছে শীলা। ভারি ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে শীলার

হাতখানা। শীলা বুঝি ভয়ে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে।

অমল অধৈর্য গলায় বললো, ' সত্যিই আমি দেখতে পাচ্ছি।'

বলতে বলতে অমল অনুভব করলো, শীলা দেখতে পাবে এই ভয়েই সেই পাখীঅলা ঈশ্বর ঘরের ঘোলাটে আলোয় নিঃশেষে মিলিয়ে গেলো মুহূর্তে।

অমল কিছু না ব'লে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে হঠাৎ যেন ফুঁপিয়ে উঠলো অসহায় ঈশ্বরের জন্য।

শীলা কিছু প্রশ্ন করছে ভয়ার্ত গলায়—না, অমল সে সব প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না।

চারদিক যখন সকালের আলোয় ভ'রে উঠলো তখন চোখ মেললো অমল। পাশে শীলাকে দেখতে পেলো না।

অবশ্য এতোক্ষণ শুয়ে থাকে না শীলা। সংসারের অনেক কাজ সকালবেলায় জমে থাকে তার জন্য। উঠেই সে জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে শীলা।

অমল আড়মোড়া ভেঙে খাট থেকে নেমে শিথিল পায়ে দরজায় এলো। কি যেন হচ্ছে মনের ভেতর। সেটা বুঝতে না পারায় অদ্ভুত একটা অস্বস্তি খেলা করছে অমলের সারা শরীরে।

বারান্দায় খাঁচাটা ঝোলানো।

কিন্তু একী, তার মধ্যে পাখীটা কোথায়?

অমল চম্‌কে উঠলো। চেঁচিয়ে ডাকলো, 'শীলা।'

রান্নাঘর থেকে শীলা ছুটে বেরিয়ে এলো। অমলের মনে হলো, এমনি একটা ডাকের জন্য বোধহয় অপেক্ষাই করছিল শীলা।

অমল উত্তেজিত গলায় বললো, 'ময়নাটা উড়ে গেলো কি ক'রে?'

শীলা অসম্ভব শান্ত গলায় বললো, 'আমিই উড়িয়ে দিয়েছি কিছুক্ষণ আগে। ঈশ্বরের কাছেই সে ফিরে যাক।'

মুহূর্তে অমলের সমস্ত শরীর শিথিল হ'য়ে গেলো। হাত বাড়িয়ে

দরজাটা ধ'রে দাঁড়ালো অমল। দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে শূন্য খাঁচাটার দিকে তাকালো একবার। ভোরের সেই স্মৃতি অমলের মনের মধ্যে সোনালী মাছের মতো খেলে বেড়াচ্ছে।

সেই পাখীকে নিয়ে আবার বুঝি পাখীঅলা ঈশ্বরের যাত্রা শুরু হয়েছে। শহর-বন্দর-মাঠ-ঘাট পেরিয়ে দু'টি নীতিবাক্য নিয়ে ক্রেতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন ঈশ্বর।

অমলের মনে হলো, সে এবার কেঁদে ফেলবে। আকাশের দিকে তাকিয়ে অমল ভাঙা গলায় বললো, 'ঈশ্বর বড়ো অসহায়, বড় বিপন্ন শীলা।'

শীলা কিছু বললো না। মাথা নীচু করে দাঁড়ালো। অমলের মনে হলো, অসহায় শীলা বিপন্ন ঈশ্বরের জন্য বেদনায় ডুবে যাচ্ছে।

পুলিনদার গ্যারেজের সুমুখ দিয়ে ছুটতে ছুটতেই ফিরছিলো বিশু। বিশুর পকেটে এখন নাইট শোয়ের একখানা টিকিট। সোজা বাড়িতে ফিরে জামাটামা পাল্টে এক্ষুণি বেরিয়ে পড়তে হবে। সন্তুরা অপেক্ষা করবে সিনেমা হলের সামনের স্টলটাতে। চা-টা খাবে ওখানেই।

অনেকদিন পর আজ সিনেমা দেখতে যাচ্ছে বিশু। কাজেই বিশু এখন রীতিমতো হাওয়ায় উড়ছে।

ছুটতে ছুটতে গ্যারেজটা প্রায় পেরিয়েই এসেছিলো, হঠাৎ অমিয়বাবুর ডাকে থামতে হলো বিশুকে।

গ্যারেজ ঘরের ভেতর থেকে অমিয়বাবু ডাক দিয়েছেন তাকে। কিছু একটা ভেবে বিশু এগিয়ে এলো গ্যারেজ ঘরের দিকে।

না, বিশু বেশীক্ষণ দাঁড়াবে না এখানে। সন্তুরা তার জন্য অপেক্ষা করছে সিনেমা হলের সামনের স্টলে। কাজেই এখানে সময় নষ্ট ক'রে ফূর্তিটা মাটি করতে পারবে না বিশু।

'ছুটতে ছুটতে কোথায় যাচ্ছিস?' গ্যারেজ ঘরের দরজায় আসতেই অমিয়বাবু শুধালেন।

'বাড়িতে।' দম নিয়ে বললো বিশু।

'কোথাও গাড়ির কাজ করছিস নাকি এখন?'

'না।' ছোট্ট ক'রে বললো বিশু।

'তোর মতো একটা গাড়ির মেকানিক ব'সে থাকবে, আমি ভাবতেই পারি না।' ব'লে একটু থামলেন অমিয়বাবু।

ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতির মধ্যে একটা লোহার চেয়ারে ব'সে আছেন তিনি। পাশে তার গাড়িখানা। বনেটটা তোলা। ইঞ্জিন খুলে নেওয়া হয়েছে। ওপাশে একটা ছেলে আলোর তলায় কি যেন ঘসছে ব'সে ব'সে।

গাড়িখানা ক'দিন হলো খারাপ হ'য়ে এমনিভাবে এখানে প'ড়ে আছে। যেতে আসতে চোখে পড়েছে বিশুর। কিন্তু বিশু জানে, গাড়িটাকে অমনিভাবে প'ড়ে থাকতে হবে বেশ কিছুদিন। কারণ গাড়িটা সারাবার জন্য এখানে আনবার পরই পুলিনদা কার যেন অসুখের খবর পেয়ে দেশে চলে গেছে। বিশুর সঙ্গে অবশ্য এর মধ্যে পুলিনদার দেখা হয়নি। গ্যারেজের ছেলেদের কাছেই খবরটা পেয়েছে বিশু।

অমিয়বাবু বললেন, 'বলছিলাম কি, তোর যখন হাতে কাজটাজ নেই, আমার একটু উপকার ক'রে দে'না।'

বিশু জানে, এবারে গাড়িটা সারিয়ে দেবার কথা বলবেন অমিয়-বাবু। তবু ইচ্ছে ক'রেই বললো, 'কি উপকার বলুন না।'

'গাড়িটাকে তুই একটু তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক ক'রে দে।' অমিয়-বাবু বললেন।

না, বিশুর আপত্তি নেই। কাজ যখন একটা পাওয়া গেছে, তখন করতে আপত্তি কি! পুলিনদার সঙ্গে এখানে অনেক কাজও করেছে বিশু। অনেক কাজও এনে দিয়েছে পুলিনদাকে। পুলিনদা বিশুকে অনেক বলেছে তার গ্যারেজে কাজ করবার জন্য। কিন্তু বাঁধা কাজ করবার স্বভাবই নয় বিশুর। সেজন্য পুলিনদাকে প্রায় সময়ই বিশু এড়িয়ে যায়।

পুলিনদা জানে, বয়স কম হ'লেও গাড়ির কাজে বিশুর মতো ওস্তাদ আর কেউ নেই এদিকে। অমিয়বাবুও অবশ্য তা জানেন।

'কিন্তু পুলিনদা শেষে কিছু বলবে না তো!' ইচ্ছে ক'রেই বিশু বললো। বিশু জানে, কাজটা তুলে দিলে খুশীই হবে পুলিনদা।

'না না, যাবার সময় তোর নামটাই ব'লে গেছে পুলিন। তোকে আমি ক'দিন থেকেই খুঁজছিলাম।' সঙ্গে সঙ্গে বললেন অমিয়বাবু।

'তাহ'লে ক'রে দেবো কাজটা।' বিশু বললো একটু ব্যস্তভাবে। সন্তুরা অপেক্ষা করছে সিনেমা হলের সামনে—মনে পড়লো হঠাৎ।

'তুই যা চাস তাই পাবি। অবশ্য একেবারে আকাশ ছোঁয়া কিছু একটা চেয়ে ফেলিস না।' এবার আস্তে আস্তে অমিয়বাবু বললেন।

হাসলো বিশু। বললো, 'আমি কিছু চাইবো না। কাজ তুলে দেবো, আপনি আপনার যা ইচ্ছে দেবেন।'

অমিয়বাবু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

বিশু বললো, 'আর কাজ যেদিন শেষ হবে, সেদিন একটা মুরগী এনে দেবেন। সবাই মিলে এখানে রান্না ক'রে খাবো। বেশ ভালো মুরগী হওয়া চাই কিন্তু।'

'কালকেই আমি একটা মুরগী কিনে এনে দেবো। যদি বলিস, এক্ষুনি কিনে আনি!' সঙ্গে সঙ্গে বললেন অমিয়বাবু।

'না না, তার দরকার নেই। কালই আনবেন। আমি এবার চলি। সকালে কাজ শুরু করবো, আপনিও একবার আসবেন।' বিশু রাস্তার দিকে পা বাড়িয়ে বললো।

অমিয়বাবু বললেন, 'আজই কাজ শুরু করতে আপত্তি কি?

একটু হাসলো বিশু। তারপর বললো, 'আজ একটা সিনেমায় যাচ্ছি। টিকিট কাটাও হ'য়ে গেছে। না হ'লে আজই ধরতাম কাজটা।'

'টিকিট যখন কেটেই ফেলেছিস, তখন আর কি করা যাবে।' অমিয়বাবু বললেন খানিকটা হতাশ গলায়।

বিশু বললো, 'আপনার কিচ্ছু ভাবতে হবে না অমিয়দা। দেখবেন, ঠিক টাইমলি কাজ তুলে দেবো।'

ব'লে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বাড়ির দিকে ছুটতে থাকলো বিশু।

আপাততঃ সিনেমা হল ছাড়া বিশু আর কিছু ভাবতেই পারছে না।

পরদিন সকাল থেকেই কাজে লেগে গেলো বিশু। অমিয়বাবু

আগেই এসে ব'সেছিলেন গ্যারেজে। বিশুকে সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে এলেন আবার। মস্ত একটা মুরগী নিয়ে এলেন সঙ্গে ক'রে।

'এই যে,'—ব'লে মুরগীটা তুলে ধরতেই লাফিয়ে উঠলো বিশু।

'একী, আজকেই নিয়ে এলেন মুরগী।' বিশু বললো এগিয়ে এসে! সত্যিই, ভারি অবাক হ'য়ে গেছে বিশু।

'তোর চোখের সামনেই আজ থেকে বাঁধা থাকলো এটা।' হাসতে হাসতে বললেন অমিয়বাবু।

ব'লে পকেট থেকে একটা শক্ত দড়ি বের ক'রে মুরগীটাকে একটা ভারি লোহার সঙ্গে বেঁধে দিলেন। মুরগীটা মাটিতে নেমেই ডানা ঝাপ্‌টালো বারকয়েক। মাথার লাল ভেলভেটের মতো ঝুঁটিটাকে নাড়ালো অদ্ভুতভাবে। গলায় শব্দ করলো। তারপর মাথা নাড়িয়ে চারদিক দেখতে থাকলো।

'দারুণ মুরগীটা এনেছেন কিন্তু।' বিশু বললো মুরগীটার দিকে তাকিয়ে।

গ্যারেজের ছোট ছেলেদু'টোও তারিফ করলো মুরগীটার।

হাসলেন অমিয়বাবু। বললেন, 'অনেক দেখেশুনে এনেছি। যেদিন কাটবি, সেদিন আমায় খানিকটা দিস কিন্তু।'

'নিশ্চয়ই পাবেন। মুরগীটা তো আর ছোট নয়—'

ব'লেই খপ্‌ ক'রে মুরগীটা ধ'রে ওজনটা দেখলো বিশু। তারপর মুরগীটাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, 'প্রায় এক কেজি মাংস হবে'—

অমিয়বাবু বললেন, 'তা হবে।'

'ক'দিন খাইয়ে আরো ওজন বাড়িয়ে দেবো।' বিশু বললো।

কথাটা শুনে হাসলেন অমিয়বাবু। বললেন, 'এবার চলি। তুই একটু হাত চালিয়ে কাজ করবি কিন্তু।'

ব'লে চলে গেলেন অমিয়বাবু।

বিশু মুরগীটাকে বার কয়েক ভালো ক'রে দেখে শিস্ দিলো কিছু সময়। তারপর কাজের মধ্যে ডুবে গেলো।

কাজ থাকলে বিশু আর বাড়ি যায় না। গ্যারেজেই থাকে দিন রাত। কাজ করে অনেক রাত পর্যন্ত। কাউকে পাঠিয়ে বাড়ি থেকে খাবারটা আনিয়ে নেয়। বিশুর মা জানে এসব। কিছু বলে না। কারণ বিশু যা করে, নিজের মতেই করে।

দুপুরবেলায় কারখানার মধ্যেই একটুখানি জায়গা ক'রে নিয়ে খেতে খেতে এসব কথা ভাবছিলো বিশু।

খেতে ব'সেই নিজের খাবার থেকে একমুঠো ভাত তুলে দিয়েছে মুরগীটাকে। মাথা নাড়িয়ে, ঝুঁটি দুলিয়ে এখন ভাতগুলো খাচ্ছে মুরগীটা।

মাছের কাঁটাগুলোও চিবিয়ে মুরগীটার দিকে ছুঁড়ে দিতে থাকলো বিশু। যেখানে কাঁটাগুলো পড়ছে, ছুটে ছুটে সেখানে গিয়ে কাঁটা-গুলো খেয়ে নিচ্ছে মুরগীটা। ব্যাপারটা বিশুর ভারি ভালো লাগছে।

কাঁটা ফুরোতেই বিশু আরো এক মুঠো ভাত দিলো মুরগীটাকে। তারপর খাওয়া শেষ ক'রে উঠে পড়লো। নিজের গ্লাসের অবশিষ্ট জলটুকু একটা ভাঁড়ে ক'রে মুরগীটার পাশেই রাখলো। জল খাবে মুরগীটা!

সত্যি সত্যি একটু পরেই মুরগীটা ভাঁড়ের জল খেলো ছিটিয়ে ছিটিয়ে। খুশী হলো বিশু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো কিছু সময়। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে কাজ নিয়ে একটুখানি ভাবলো। সিগারেটটাকে ঠোঁটে ঝুলিয়ে নিয়েই তারপর ডুবে গেলো কাজের মধ্যে।

রাত্রিবেলাও খাবার আনিয়ে নিজে খাবার আগেই মুরগীটাকে খাওয়ালো বিশু। খেয়ে নিক। ক'দিনে স্বাস্থ্যটাও একটু ভালো ক'রে নিক মুরগীটা। মনে মনে কথাটা ভেবে বিশু খুশীই হলো।

মুরগীর খাওয়া হ'তেই বিশু নিজের খাবারটা খেয়ে নিলো।

তারপর রাত বারোটা পর্যন্ত একটানা কাজ করলো একাই।

সন্ধ্যে হ'তে হ'তেই গ্যারেজের ছেলে দু'টো চলে গেছে। মুরগীটা সারা সময় ঘরের মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছে। আলো আর শব্দের জন্য বোধহয় চুপচাপ বসতে পারেনি কোথাও।

বারোটা বাজতেই কাজ বন্ধ করলো বিশু। সাবান দিয়ে ঘ'সে ঘ'সে হাত মুখ ধু'য়ে ফেললো।

হাতটা মুছে গ্যারেজ ঘরের মধ্যেই একখানা পুরোনো খাটিয়ার ওপর বিছানা পাতলো কোনোরকমে। বারকয়েক হাই তুললো। তেল কালিমাখা জামাপ্যাণ্ট পাল্‌টে নিলো তাড়াতাড়ি। আলো নিভিয়ে তারপর শুয়ে পড়লো।

মুরগীটা অন্ধকার ঘরের মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। স্পষ্ট বুঝতে পারলো বিশু। অস্পষ্ট কিছু শব্দ করলো গলায়! ঘরখানা বুঝি একদিনেই চেনা হ'য়ে গেছে মুরগীটার।

সত্যিই, খাসা মুরগীটা। টাকা নয়, মুরগীটার জন্যই বুঝি পরিশ্রম ক'রে যাচ্ছে বিশু।

মুরগীটার কথা, অমিয়বাবুর কথা এবং গাড়িটার কথা ভাবতে ভাবতে বিশু কখন যে ঘুমিয়ে পড়লো তা নিজেই জানলো না।

সকালবেলা মুরগীর ডাকে বিশুর ঘুম ভাঙলো। চোখ খুলবার আগেই মনে হলো, তার কোলের কাছ থেকে মুরগীটা ডেকে উঠেছে। চোখ খুললো বিশু। দেখলো, জানালা দিয়ে রোদ্দুর আসছে। সেই রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে মুরগীটা মাথার লাল ভেলভেটের মতো ঝুঁটি নাড়িয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে।

অবাক হ'য়ে মুরগীটার দিকে তাকিয়ে উঠে পড়লো বিশু।

কখন বিছানায় উঠে পড়েছে কে জানে!

'এ্যাই নাম—নাম--' ব'লে চেঁচিয়ে উঠলো বিশু।

সঙ্গে সঙ্গে ডানা ঝট্‌পট্ ক'রে লাফিয়ে নামলো মুরগীটা।

চেঁচিয়ে বারকয়েক ডাকলো। তারপর গাড়ির মাথায় উঠে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলো।

মুরগীটার দিকে তাকিয়ে একা একাই হাসলো বিশু। তারপর আড়মোড়া ভেঙে নেমে পড়লো বিছানা থেকে।

মুড়ি আর চা খাবার সময় মুরগীটাকে কিছু মুড়ি দিলো বিশু। খুঁটে খুঁটে মুড়ি খেলো মুরগীটা। পায়ে দড়ি নিয়েই গতকালের মতো ঘরময় ঘুরে বেড়াতে থাকলো।

খাবার জিনিসটাকে অমনি চোখের সামনে রাখতে বেশ লাগছে বিশুর। অমিয়বাবুর বুদ্ধি আছে, মুরগীটা আগেই এনে দিয়েছে।

ভাবতে ভাবতেই গ্যারেজের ছেলে দু'টোর জন্য আর অপেক্ষা না ক'রে কাজ শুরু করলো বিশু!

কাজের মধ্যে দিয়ে দু'টোদিন কি ক'রে কেটে গেলো বিশু তা টেরই পেলো না।

তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় বিশু গাড়ির কাজ শেষ ক'রে ফেললো।

অমিয়বাবু এলেন খবর পেয়েই। বললেন, 'কাল ট্রায়াল দিয়ে দেখতে হবে।'

বিশু বললো, 'আমি ভেবেছিলাম আজই গাড়ি নিয়ে বেরুবো।'

'আজ বরং মুরগীর জন্য মশলা কিনে নিয়ে আয়। কাল সকালেই ওটাকে কাটা হবে।' ব'লে অমিয়বাবু পকেট থেকে টাকা বের করলেন।

'সেই ভালো।' ব'লে হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিলো বিশু।

বনেট তুলে অমিয়বাবু এঞ্জিনের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'খুব উপকার করলি কিন্তু। গাড়িটা না হ'লে আর চলছিলো না আমার।'

তারপর বনেট নামিয়ে সীটে ব'সে স্টার্ট দিয়ে দেখলেন। এটা সেটা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন ভেতরে ব'সেই।

বিশু বললো, 'কি, ঠিক আছে ?'

'ঠিক না থেকে পারে ?' ব'লে গাড়ি থেকে নেমে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন অমিয়বাবু।

'চলুন তাহ'লে। আমিও তো বাজারের দিকে যাবো।' বিশু বললো খুশী-খুশী গলায়।

অমিয়বাবু বললেন, 'চল্।'

ছেলে দু'টো কাজ সেরে চলে গেছে, সুতরাং বিশু নিজেই গ্যারেজ ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে অমিয়বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লো।

পরদিনও সকালবেলায় মুরগীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেলো বিশুর। বিশু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকিয়ে দেখলো, ঠিক তেমনি বিছানার ওপর তার পাশে ওম্ দেবার মতো ক'রে ব'সে মুরগীটা খোলা জানালা দিয়ে মাঝে মাঝে আলোর দিকে তাকাচ্ছে। অদ্ভুত একটা শব্দ করছে গলায়।

তাকিয়েই রইলো বিশু। মুরগীটা তার গা ঘেঁসে ব'সেই আছে। এই তিন রাত তারা একসঙ্গে, এক বিছানায়। এখন আর তাকে ভয় পায় না মুরগীটা। এই তো, বিশুকে ঘুম ভেঙে উঠতে দেখেও নেমে পড়ছে না বিছানা থেকে। যেমন ক'রে বসেছিলো, তেমনি ক'রেই ব'সে আছে।

বিশু ভাবতে গিয়ে অবাক হ'য়ে গেলো। এই মুরগীটাকেই আজ রান্না ক'রে ফেলবে বিশু। ঘরের কোণায় সন্ধ্যেবেলা এনে রাখা স্টোভটা এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছে। বালিশের তলায় হাত ডোবালেই ছুঁয়ে ফেলবে মশলার প্যাকেটগুলো।

বিশু একটু অস্বস্তিবোধ করলো। অথচ কেন যে অস্বস্তিবোধ করলো, তা ঠিক ধরতে পারলো না।

মুরগীটা উঠে দাঁড়ালো হঠাৎ। জানালার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো জোরে। গলাটা ফুলে উঠলো মুরগীটার। লাল ভেলভেটের

মতো ঝুঁটিটা দুলে উঠলো।

মুরগীটাকে হঠাৎ যেন নতুন ক'রে দেখলো বিশু। অবাক হ'য়ে গেলো মনে মনে।

ঘরের মধ্যে এখন আর অন্ধকার নেই। জানালা দিয়ে জোয়ারের মতো আলো আসছে। ঘরের ভাঙাচোরা যন্ত্রপাতিগুলো দেয়ালের গায়ে, মেঝের ওপর স্তূপ হ'য়ে আছে। সে সব দেখতে ইচ্ছে হলো না বিশুর। তিন দিনটে দিন এসব নিয়ে কাজ করে আজকে বিশু যেন খানিকটা ক্লান্ত। মুরগীটার দিকেই তাকিয়ে রইলো বিশু। লাল ঝুঁটিটা তার নড়ছে। গলায় শব্দ হচ্ছে তেমনি।

বিশু ঠিক তেমনি অস্বস্তিবোধ করলো আবার। উঠতে পর্যন্ত ইচ্ছে হলো না। সিগারেটের প্যাকেটটা বালিশের পাশে, কিন্তু একটা সিগারেট ধরাতেও ইচ্ছে হলো না বিশুর। বিশু ঠিক যেন বুঝতে পারছে না, মনের ভেতর তার কি হ'য়ে চলেছে।

না, এমনটা কোনোদিন হয়নি বিশুর।

এমনি গাড়ি সারিয়ে দিয়ে কতো মুরগী যে খেয়েছে বিশু, তা বুঝি গুণে শেষ করা যাবে না। অথচ—

অদ্ভুত এক উত্তেজনায় বিশু উঠে বসলো। সহজভাবে শিস্ দিতে চাইলো, কিন্তু শিস্ দেবার ইচ্ছেটা ম'রে গেলো আশ্চর্যভাবে।

এসব কথা যতো ভাবতে থাকলো, ততো অসহায় হ'তে থাকলো বিশু।

মুরগীটা লাফিয়ে নামলো খাট থেকে। ডানা দু'টো ঝাপটালো। সামান্য একটু উড়ে জানালার সামনে রাখা ভাঙা একটা রডের ওপর বসলো। চেঁচিয়ে উঠলো আর একবার। সকালের বাতাস যেন রৌদ্রের সঙ্গে জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো বিশুকে।

আর বুকের ভেতরের উত্তেজনাটুকু ধ'রে রাখতে পারলো না বিশু। দড়ির ওপর থেকে জামাটা নিয়ে প'রে ফেললো। খাটিয়ার তলা

থেকে চটিজোড়া বের ক'রে পায়ে গলিয়ে নিলো মুহূর্তে। দ্রুত পায়ে বাইরে এলো তারপর। দরজাটা টেনে দিয়ে এবার তেমনি দ্রুত পায়ে অমিয়বাবুর বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলো।

কি বলবে অমিয়বাবুকে?

না, বিশু তা জানে না। তবু কিছু একটা বলতে হবে।

নিজেকে নিজেই বুঝতে পারছে না বিশু। বুকের ভেতর আরেকটা অচল মোটর গাড়ি বুঝি সচল হ'য়ে উঠেছে। বিশুর চাইতে আরো বড়ো কোনো মেকানিক বুঝি তেল কালি মেখেছে সেই মোটর গাড়িকে সচল ক'রে তুলবার জন্য।

খবরটা একবার চেঁচিয়ে ব'লে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে বিশুর।

ভাবতেই সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। আরো দ্রুত ছুটতে থাকলো বিশু।

খুব কম সময়ের মধ্যেই অমিয়বাবুর বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো। উত্তেজনায় ধ্বক্ ধ্বক্ করছে বুকের ভেতরটা।

অমিয়বাবু বাইরের ছোটো বাগানের ভেতর দাঁড়িয়ে একটা গাছ দেখতে দেখতে দাঁতে ব্রাস ঘসছেন। খানিক আগে ঘুম থেকে উঠেছেন মনে হচ্ছে। অমিয়বাবুর দিকে তাকিয়ে কিছু বলবার জন্য ভেতরে ভেতরে নিজেকে গুছিয়ে তুলতে থাকলো বিশু।

'একীরে, তুই হঠাৎ? কি হলো?' হঠাৎ বিশুকে দেখেই অবাক হ'য়ে শুধালেন অমিয়বাবু।

'না, কিছু হয় নি।........একটা কথা বলতে এসেছি শুধু—' ব'লে থামলো বিশু। ঠিক যা বলবে, তা গুছিয়ে নিতে পারছে না। এলোমেলো হ'য়ে যাচ্ছে সব। ঠিক এমন কথা সে কোনোদিন বলতে শেখে নি। বলতে শিখলেও হয়তো এসব কথা একবারে অন্ততঃ সহজে বলা যায় না। অথচ কথাটা তাকে বলতে হবেই।

'কী, টাকা চাই কিছু?' হেসে বললেন অমিয়বাবু।

'না, টাকা নয়, পুরো মুরগীটাই চাই।' বিশু অধৈর্যভাবে বললো।

'পুরো মুরগীটা চাই মানে? ওটা তো তোর জন্যেই। আজকেই তো ওটাকে কেটেকুটে তুই যা ইচ্ছে তাই করবি। একটুখানি মাংস শুধু আমি চেয়েছিলাম।' অবাক হ'য়ে বললেন অমিয়বাবু।

'না না, মুরগীটাকে আমি কাটবো না। পুষবো। আপনি আমায় পুরোপুরি দিয়ে দিন মুরগীটা—'

'সে কীরে, তোর আবার মুরগী পুষবার সখ হলো কেন? অমনি চমৎকার একটা খাবার জিনিস কেউ পোষে।' অমিয়বাবুর হু'চোখ আর বিশুর দিক থেকে সরলো না।

বিশু বুঝতে পারছে, অমিয়বাবু তার ভেতরের কথাটাকে দারুণভাবে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

কিন্তু বিশু কিছু বলতে পারলো না। মুরগীটার চেহারা মুহূর্তে চোখে ভেসে এলো। জানালার উজ্জ্বল রোদের দিকে তাকিয়ে ডেকে উঠছে মুরগীটা। তার লাল ঝুঁটিটা নড়ছে। ভোরবেলাটাকে ঠিক বুঝতে পারে মুরগীটা, আলো দেখলে খুশী হয়—ঠিক বিশুর মতোই একটা শরীর নিয়ে বেঁচে আছে মুরগীটা। তার মধ্যে বিশুর মতোই সুখ আছে, হয়তো হুঃখও আছে। বিশু হঠাৎ কি ক'রে যেন তা টের পেয়ে গেছে। এই টের পাবার খবরটা কি ক'রে বিশু অমিয়বাবুকে দেবে?

উত্তেজনায় প্রায় ঝুঁকে পড়লো বিশু।

অমিয়বাবু একটুখানি ভেবে খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'ঠিক আছে, তুই নিয়ে নে মুরগীটাকে। তোকে দিয়েছি, খেলে খাবি, না হ'লে যা ইচ্ছে তা-ই করবি। একটুখানি মাংস নিয়ে আমার আর কি হতো।'

বিশু ফিরলো সঙ্গে সঙ্গে। অসম্ভব দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করলো।

সকালের রোদের রঙ্ কি পালটে গেছে? পাখীর ডাকে কি ডুবে গেছে চারদিকের শব্দ?

বিশু নিজেই বুঝি চিনতে পারছে না নিজেকে। অমিয়বাবু চিনবে কি ক'রে? বড় ক'রে একটা নিশ্বাস নিলো বিশু।

মনে মনে শুধু ভাবলো, মুরগীটা বুঝতেও পারবে না তার মৃত্যুদণ্ড হয়েছিলো এবং তা বাতিলও হ'য়ে গেছে। তবু বিশুর মনে হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি এই খবরটা তাকে দেওয়া দরকার।

বিশু এবার প্রায় ছুটতে থাকলো।

বিকেলবেলা আনন্দবাবুর ঘরের সামনে পৌঁছে সীমা দেখলো দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। সীমা একটু সময় দাঁড়িয়ে থাকলো দরজার সামনে। মনে মনে ভাবলো, বই দেবার কথাটা আনন্দবাবুকে স্মরণ করিয়ে দিতে নিশ্চয়ই লজ্জা নেই। ঠিক ভুলে গেছেন তিনি।

ভুলে যাওয়াটা অন্যায় নয়। সীমা ভাবলো। সারাটা দিন পড়াশুনোর মধ্যে ডুবে থাকেন আনন্দবাবু। হঠাৎ কোনোদিন হয়তো বিকেলের দিকে এসে চুপচাপ বসেন পার্কের বেঞ্চে। আকাশ দেখেন, গাছপালা দেখেন। প্রায় বছর দশেক হলো কলেজের চাকরীটা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। সে সময় অবশ্য আনন্দবাবুকে সীমা দেখেনি। কারণ মাত্র একবছর হলো বিয়ে হয়েছে সীমার। তার পরই সীমা এপাড়ায় এসেছে।

এই একবছরে দিনকয়েক আনন্দবাবুকে পার্কে দেখেছে সীমা। অস্বাভাবিক পুরু কাঁচের চশমা চোখে শীর্ণ চেহারার মানুষটিকে অসম্ভব স্নিগ্ধ মনে হয় সীমার। স্পষ্টই মনে হয়, বইয়ের জগত ছাড়া দ্বিতীয় কোনো জগত নেই আনন্দবাবুর। সীমা মুগ্ধ না হ'য়ে পারেনি।

সে জন্যেই সুধাময়কে দিয়ে আনন্দবাবুকে নেমন্তন্ন করিয়েছিলো। অবশ্য সুধাময় বলেছিলো, আনন্দবাবু গাড়ি পাঠালেও আসবেন না। তাঁর সেই একমাত্র পৃথিবী ছেড়ে তিনি নিশ্চিতই মিটিঙের মত প্রকাশ্য জায়গায় আসতে ভয় পাবেন। সীমার ক্ষীণ একটা বিশ্বাস ছিলো, লাইব্রেরী সংক্রান্ত মিটিঙ যখন তখন আনন্দবাবু আসতেও পারেন।

এসেও ছিলেন আনন্দবাবু। তাঁকে আনতে কিন্তু কাউকে পাঠাতে হয়নি। সবাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো আনন্দবাবুর এমনি ক'রে হঠাৎ নিজে থেকেই মিটিঙে আসবার জন্য।

সমস্ত শুনে আনন্দবাবু বলেছিলেন, 'লাইব্রেরীর জন্য খানকুড়ি বই আমি পাঠিয়ে দেবো।'

সীমা জানে, মিটিঙ থেকে বেরিয়ে কথাটাকে নিশ্চিতভাবেই ভুলে গেছেন তিনি। কারণ তারপর একটা সপ্তাহ ফুরিয়ে গেছে, যাঁদের বই দেবার কথা, সবাই পাঠিয়েও দিয়েছেন বই। কেবল আনন্দ-বাবুর কাছ থেকে কোনো বইও নেই, খবরও নেই। শংকরও বলেছে, আনন্দবাবু ভুলে গেছেন। নাহ'লে পরদিনই বই এসে যেতো।

সীমা শংকরকে বলেছিলো একদিন খোঁজ নেবার কথা। কিন্তু শংকর সময় পায়নি খোঁজ নেবার। সীমা অবশ্য জানে, শংকর আনন্দবাবুকে বইয়ের কথা জিজ্ঞেস করতে পারবে না ব'লেই সময় পায়নি। নাহ'লে লাইব্রেরীর জন্য যে শংকর এতো কাজ করেছে, সে এতোটুকু কাজ করতে পারতো না নাকি!

শংকরকে আর বলেনি সীমা। আজ নিজেই চ'লে এসেছে। কৌশলে বইয়ের কথাটা একবার আনন্দবাবুকে স্মরণ করিয়ে দেবে।

আস্তে ক'রে দরজায় টোকা দিলো সীমা।

ভেতর থেকে আনন্দবাবুর গলা ভেসে এলো, 'কে?'

'সীমা' বললে হয়তো চিনবেন না আনন্দবাবু, ভাবলো সীমা। বরং 'লাইব্রেরী থেকে এসেছি' বললে নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। কাজেই লাইব্রেরী থেকে আসবার কথাটাই বললো সীমা।

আনন্দবাবু দরজাটা খুলে দিলেন।

আনন্দবাবু সীমাকে দেখে কি ভাবলেন, পুরু চশমার মধ্য দিয়ে তাঁর বিস্ফারিত দু'টি চোখের দিকে তাকিয়ে সীমা তা অনুভব করতে পারলো না। সীমা নিজেই নিজের দিকে তাকিয়ে আনন্দবাবুর ভাবনাটাকে অনুভব করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না।

'ভেতরে এসো!' আনন্দবাবু বললেন আস্তে আস্তে।

ব'লেই নিজে ফিরে গেলেন তক্তপোষে। খোলা দরজায় পর্দাটা পাহারা রইলো।

সীমা ভেতরে এসে, দাঁড়িয়ে ঘরখানাকে দেখতে থাকলো। কাগজ-পত্রে ঠাসা হ'য়ে আছে ঘরখানা। দু'টো জানালা বন্ধ, দু'টো খোলা। নীলরঙের বিবর্ণ পর্দা সেগুলোয়। খুব আস্তে আস্তে ফ্যান ঘুরছে মাথার ওপর। দেয়ালে মহাপুরুষদের খানকয়েক ছবি। ছবিগুলোর ওপর ধূলো জ'মে আছে। মোছা হয়নি অনেককাল। একধারে বই বোঝাই দু'টো বুকশেল্‌ফ্‌।

আনন্দবাবু বললেন, 'বোসো।'

একটা কাঠের চেয়ারে বসলো সীমা। চেয়ারে একটা গদি ছিলো। গদিটা পুরোনো হ'য়ে শক্ত হ'য়ে গেছে।

'আমি সেই নতুন লাইব্রেরী থেকে এসেছি।' সীমা বিনীতভাবে বললো।

আনন্দবাবু তার দিকে তেমনি চশমার মধ্য দিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকালেন। বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। তোমার নামটাও আমার মনে আছে।'

সীমা বললো, 'এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো?'

'না না, বিরক্ত হবো কেন?' লজ্জিত হলেন আনন্দবাবু।

সীমা খুশী হলো। আনন্দবাবুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ঘরের ছবিগুলির ওপর চোখ ফেরাতে থাকলো।

হঠাৎ সাগ্রহে আনন্দবাবু শুধালেন, 'লাইব্রেরী কেমন চলছে?'

সীমা বললো, 'চমৎকার।'

আনন্দবাবু বললেন, 'পাড়ার মধ্যে একটা লাইব্রেরী না হ'লে হয়? ছেলেমেয়েরাও লাইব্রেরী দেখতে দেখতে খানিকটা পড়াশুনোর দিকে ঝুঁকবে। নাটক নভেল পড়লেও জ্ঞান বাড়ে।'

খানিক থেমে ফের বললেন, 'লাইব্রেরীর ব্যাপারে তোমার স্বামীর খুব উৎসাহ, ব্যাপারটা আমি মিটিঙের নেমন্তন্ন পেয়েই বুঝতে পেরেছিলাম।'

নিজেদের সম্পর্কে শুনে সীমা একটু লজ্জা পেলো। মুখ

ফিরিয়ে ফের দেয়ালের ছবি, মেঝের ছড়ানো কাগজপত্র ইত্যাদি দেখলো। লাইব্রেরীর ব্যাপারে শংকরের সত্যিই খুব উৎসাহ। শংকর এগিয়ে না এলে সীমা নিশ্চয়ই এসব করতো না। শংকর নিজেই নেমন্তন্ন করেছে সবাইকে, নিখিলেশবাবুর বাইরের দিককার ঘরটা লাইব্রেরীর জন্য বিনা ভাড়ায় আদায় করেছে,গোটা তিনেক আলমারীও জোগাড় করেছে বইয়ের জন্য। কিছু ডোনেশানও সংগ্রহ করেছে।

এখন বই-টই সব গুছিয়ে তোলার ভার সীমার ওপর। অবশ্য সীমা আর এখন একা নয়। পাড়ার সবাই এসে দাঁড়িয়েছে পাশে।

আনন্দবাবু হঠাৎ লজ্জিত গলায় বললেন, 'আমি খানকুড়ি বই দেবো বলেছিলাম। কথাটা এখন মনে পড়লো। ভাগ্যে তুমি এসেছিলে, না হ'লে আর মনেই পড়তো না।'

সীমা হেসে বললো, 'আমরা কিন্তু বইগুলো ঠিকই নিয়ে যেতাম।'

আনন্দবাবু হাসলেন কথাটা শুনে। বললেন, 'কাল তোমাদের ওখানে পৌঁছে দেবো বইগুলো।'

সীমা খুশী-খুশী গলায় বললো, 'যদি বলেন আমরাও এসে নিয়ে যেতে পারি।'

'আমার একটুও অসুবিধে হবে না পাঠাতে। তোমাদের কারো আসবার দরকার নেই।' আনন্দবাবু লজ্জিতভাবেই বললেন।

সীমা ভেতরে ভেতরে স্বস্তি পেলো খানিকটা। বইয়ের কথা যেচে বলতে হলো না তাকে। আনন্দবাবুর মুখের দিকে তাকালো সীমা। কি যেন ভাবছেন আনন্দবাবু।

না, আর বসা ঠিক নয়। সীমা উঠে দাঁড়ালো। বললো, 'আমি এবার যাবো।'

সীমার মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দবাবু বললেন, 'মাঝে মাঝে লাইব্রেরীর খবর যেন পাই।'

'আচ্ছা।' ব'লে সীমা পর্দা ঠেলে বাইরে এলো।

সীমা এখন নিশ্চিন্ত, আগামীকাল আনন্দবাবুর বইগুলো পেয়ে

যাবে।

লাইব্রেরীর কথা ভাবতে ভাবতে স্বচ্ছন্দ পায়ে বাড়ীর দিকে ফিরতে থাকলো সীমা।

পরদিন সীমা যখন বইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলো, তখন আনন্দবাবুর একখানা তু'লাইনের চিঠি এলো। একটি ছেলে দিয়ে গেলো চিঠিখানা। আনন্দবাবু তার শেল্‌ফ্‌ থেকে বই বেছে নিয়ে যাবার জন্য লিখেছেন। বই বাছতে গিয়ে তিনি নিজে আর বই বাছতে পারছেন না।

মনে মনে হাসলো সীমা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি একটুখানি প্রসাধন করলো। শাড়ি ব্লাউজও পালটালো। যে-যে বই পাওয়া গেছে আর কেনা হয়েছে, তার লিস্টটা নিয়ে নিলো ব্যাগের মধ্যে। হাল্‌কা চটিটা গলিয়ে নিলো পায়ে।

শংকর আপিস থেকে এসে কোথায় যেন গেছে। ন'টার আগে নিশ্চয়ই ফিরবে না। তবু ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে এসে নীচের ঘরে চাবিটা রেখে সীমা রাস্তায় নামলো।

এখনও সন্ধ্যা নয়। যতোটুকু আকাশ দেখা যাচ্ছে ততোটুকু এখন গোধূলির আলোয় উজ্জ্বল। অন্ধকার হ'তে এখনও দেরী আছে। দ্রুতপায়ে হেঁটে আনন্দবাবুর দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো সীমা। আস্তে ক'রে টোকা দিলো দরজায়। ভেতর থেকে গতকালের মতোই গম্ভীর গলা ভেসে এলো, 'কে ?'

সীমা বললো, 'আমি, সীমা।'

'দাঁড়াও, দরজা খুলছি।'

দরজা খুলেই সীমাকে ভালো ক'রে একবার দেখে নিয়ে আনন্দবাবু বললেন, 'তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। চিঠি পেয়েছিলে নিশ্চয়ই।'

'চিঠি পেয়েই আসছি।' সীমা বললো।

আনন্দবাবু শেল্‌ফগুলো দেখিয়ে অসহায়ভাবে বললেন, 'শেল্‌ফ থেকে বই আর বাছতে পারছিনা। তাছাড়া ভাবলুম, তোমাদের লাইব্রেরীর জন্য বই তোমাদের নিজেদের বেছে নেয়াই ভালো।'

সীমা হাসলো। শেল্‌ফের কাছে এলো আস্তে আস্তে। অগোছালোভাবে রাখা অজস্র বই শেল্‌ফে। এর ভেতর থেকেই কুড়িখানা বই বেছে নিতে হবে। ব্যাগ খুলে বইয়ের লিস্টখানা বের করলো সীমা।

আনন্দবাবু বললেন, 'ওটা কি বের করলে?'

'যে-যে বই আছে, তারই একটা লিস্ট। সেগুলো বাদ দিয়ে বই নেবো।' লিস্টখানা তুলে ধ'রে বললো সীমা।

আনন্দবাবু বললেন, 'একখানা বই দু'কপি হ'য়ে যেতে পারে ভেবেই আরো আমি বাছতে পারিনি।'

সীমা আনন্দবাবুর দিকে ফিরে একবার দেখলো। তিনি তক্তপোষে গিয়ে বসেছেন। চশমার ভেতর দিয়ে তাঁর বিস্ফারিত চোখদু'টো কি যেন ভেবেই চলেছে।

সীমা আস্তে আস্তে বললো, 'আপনি আপনার কাজ করুন, আমি বইগুলো দেখছি।'

ব'লেই বইগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়লো সীমা। বেছে নেবার সুবিধের জন্য শেল্‌ফের মধ্যে বইগুলোকে সাজিয়ে ফেললো প্রথমে। তারপর হাতের কাগজখানা চোখের সামনে রেখে বইগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ একবার আনন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে বললো, 'আপনি এতোসব বই পড়েছেন?'

'শেল্‌ফের সব বই আমি পড়েছি। খুব ভালো ক'রেই পড়েছি। চেষ্টা করলে বইগুলো থেকে দু'একটা লাইনও ব'লে দিতে পারি। তোমরা আমায় যা ভাবো, আমি তা নই। কেবল পড়ার বই প'ড়ে আমি আমার সময় কাটাই না।' খানিকটা হাল্‌কা গলায় বললেন আনন্দবাবু।

সীমা হাসলো। শেল্‌ফের দিকে তাকালো ফের। তাকাতেই একখানা বইয়ের ওপর চোখ পড়লো। চোখ মুখ লাল হ'য়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে। এ বইখানা সীমা অনেকদিন আগেই পড়েছে। প'ড়ে লুকিয়ে রেখেছে। শংকরকেও পড়তে দেয়নি।

আনন্দবাবু এ বই থেকেও হয়তো দু'চার লাইন মুখস্থ ব'লে দিতে পারেন।

সীমা লিস্টের দিকে চোখ রেখেই ভাবতে চেষ্টা করলো,সেই স্পষ্ট এবং অশ্লীল বর্ণনাগুলো পড়তে গিয়ে আনন্দবাবু কী ভেবেছিলেন! আনন্দবাবু বইখানা পড়তে পড়তে হয়তো জীর্ণ তক্তপোষের ওপর শুয়ে কালো অক্ষরের মধ্য দিয়ে নারীর একটি উত্তপ্ত শরীর গ'ড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। হয়তো তার বুকের মধ্যে একটা নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে তাঁকে তাঁর নিজের মধ্যেই ছুটিয়ে বেড়াচ্ছিলো ক্রমাগতঃ। তিনি তখন নিশ্চয়ই ভেবে ফেলতে পারেননি সুখের একটি মুহূর্ত কতো তীব্র হ'তে পারে! অথচ হয়তো ভেবে ফেলতে চাচ্ছিলেন।

আর নিশ্চয়ই তখন দেখতে পেয়েছিলেন নিজের পৃথিবীটা তাঁর সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে জীর্ণ তক্তপোষের মতো অপরিসর হ'য়ে একমাত্র তাঁকেই ধারণ ক'রে আছে।

মনের মধ্যে এই ভাবনাকে নিয়ে সীমা খানিকটা স্থানুর মতোই দাঁড়িয়ে রইলো।

তক্তপোষে বসেই বুঝি আনন্দবাবু সীমাকে অমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন। হেসে বললেন, 'দাঁড়াও, আমি তোমায় সাহায্য করি খানিকটা।'

আনন্দবাবু উঠে এলেন তাঁর তক্তপোষ থেকে। সীমার পাশে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে সীমার হাত থেকে লিস্টটা নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন। সীমা একটু সরে দাঁড়ালো। কারণ সীমার ভয় হচ্ছিলো তার শরীরের উত্তাপ হয়তো আনন্দবাবুর শরীরে লাগবে। বইয়ের লাইনগুলো দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে

ফেলবে একটা।

কথাটা ভেবে সীমা আনন্দবাবুর দিকে চোখ রাখলো। আনন্দবাবু গভীরভাবে বইয়ের নামগুলো পড়ে যাচ্ছেন।

পড়া হতেই মুখ তুলে আনন্দবাবু বললেন, 'এর কয়েকখানা বই শেল্‌ফে আছে। লিস্টখানা ধরো, আমি সেগুলো বাদ দিয়ে অন্যগুলো দিচ্ছি তোমার হাতে।'

ব'লেই সীমার হাতে লিস্টখানা গুঁজে শেল্‌ফের বইয়ে হাত দিলেন। তারপর ক'খানা বই তুলে সে বইগুলোর নাম বললেন। সীমার দিকে না তাকিয়েই শুধালেন, 'এ বইগুলো আছে?'

সীমা বললো, 'ওগুলো নেই আমাদের।'

ব'লেই হাত বাড়ালো সীমা। আনন্দবাবু সীমার হাতে বই দিতেই সে পাশের ছোটো টেবিলে বইগুলো তুলে রাখলো।

এমনি ক'রে অনেকগুলো বই টেবিলে জমলো।

আনন্দবাবু সেই বিশেষ বইখানা তুলে ধ'রে নাম বললেন এবার।

অসহায় লজ্জায় বইখানার জন্য নিঃশব্দে হাত বাড়ালো সীমা।

আনন্দবাবু হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন। বইখানা সীমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'পড়েছো বইখানা?'

সীমা চোখ নামিয়ে লজ্জিত গলায় বললো, 'পড়েছি।'

আনন্দবাবু বললেন, 'কেউ কেউ আমায় বলেছে, বইখানা নাকি অশ্লীল। সেজন্যেই বইখানা আমি অনেকটা সময় ধ'রে পড়েছি।'

সীমা প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্যে আনন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বলতে চাইলো। আনন্দবাবু তার আগেই বললেন, 'নগ্ন ক'রে অনেক কথা বলা হয়েছে সত্যি, কিন্তু ভেতরের শক্তি থাকলে তা আমাদের একটুও বিচলিত করতে পারে না। সুতরাং নিশ্চয়ই তা আর অশ্লীল হয়ে ওঠে না। আমাদের ভেতরে অভাব হলো শক্তির।'

সীমা বললো, 'ক'জনা সেই শক্তির অধিকারী হ'তে পারে।

এতো লোভ চারদিকে যে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই শক্তি ক্ষয়ে যায়। দুর্বল হ'য়ে যাই আমরা।'

আনন্দবাবু বললেন, 'লোভকে তুচ্ছ করতে জানতে হয়।'

অন্তরে অন্তরে তীব্র হ'য়ে উঠলো সীমা। বললো, 'সব লোভকে সব সময় তুচ্ছ করা যায় না।'

আনন্দবাবু বললেন, 'যায়। আমিই তো যে কোনো লোভকে তুচ্ছ করতে পারি।'

সীমার মনে হলো, কথাটা কিছুতেই ঠিক নয়। ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হলো সীমা। বললো, 'বিশেষ কিছু লোভের চেহারা হয়তো আপনার বইয়ের দেয়ালে আড়াল হ'য়ে গেছে। আড়াল ভাঙলে তুচ্ছ করতে পারতেন না।'

আনন্দবাবু মৃদুস্বরে বললেন, নিশ্চয়ই পারতুম।'

'না, পারতেন না।' ব'লে একটু থামলো সীমা। তারপর বললো, 'তাহ'লে কিছু একটা ভয় আপনাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। সে ভয় থেকে উত্তীর্ণ হতে পারেন নি আপনি। তাই লোভকে তুচ্ছ করবার পিছনে আপনার ভয় আছে।'

কথাটা ব'লেই সীমা আনন্দবাবুর দিকে তাকালো। আনন্দবাবুর কপালে অজস্র রেখা। রেখার মধ্যে ঘামের বিন্দু। বিস্ফারিত চোখ দু'টোকে আরো অনেক বেশী বিস্ফারিত ক'রে আনন্দবাবু কি যেন অনুভব করতে চেষ্টা করছেন।

হঠাৎ আনন্দবাবু খানিকটা দৃঢ়স্বরে বললেন, 'না নেই।'

সীমা ভেতরে ভেতরে চেঁচিয়ে উঠলো,আছে, 'আছে, আছে।'

তারপর হঠাৎ আশ্চর্য একটা কাণ্ড করলো। শরীরের মধ্যে তার উত্তপ্ত যৌবনটাকে সংহত ক'রে সে ঝাঁপিয়ে পড়লো আনন্দবাবুর শরীরের ওপর। বুকের আঁচল তার খ'সে পড়লো। খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়লো পিঠে। আনন্দবাবুকে সে উত্তপ্ত বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে মুখে, কপালে মুখ ঘসতে থাকলো।

চশমাটা খানিকটা দূরে ছিটকে পড়লো আনন্দবাবুর চোখ থেকে। সম্ভবতঃ চশমাটা ভেঙে চৌচির হ'য়ে গেলো। সীমার উত্তেজিত নিঃশ্বাস ভ'রে ফেললো ঘরখানা।

কয়েকটা মুহূর্ত বুঝি সীমার বুকে পিষ্ট হলেন আনন্দবাবু। যৌবনের উত্তাপে উত্তপ্ত হলেন।

সীমা নিজেকে এবার সরিয়ে নিতে গিয়েই দেখলো, হঠাৎ নিদারুণ শক্তিতে আনন্দবাবু দু'হাতের বন্ধনে বেঁধে ফেলেছেন তাকে। সীমার উন্মুক্ত কাঁধে গলায় উত্তপ্ত মুখ ডুবিয়ে দিয়েছেন।

ভয়ার্ত সীমা সজোরে ঠেলে দিলো আনন্দবাবুকে। আনন্দবাবুর হাতের বন্ধন খুলে গেলো। খানিকটা দূরে ছিটকে পড়লেন তিনি। মুহূর্তে সীমা ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় এক নিঃশ্বাসেই পর্দার এপিঠে এলো। এক মুহূর্ত দাঁড়ালো। মাটিতে লুটানো আঁচলটাকে তুলে নিলো বুকের ওপর। পিঠের একরাশ চুল নিয়ে দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকলো। নামতে নামতেই সীমা শুনতে পেলো, আনন্দবাবু আশ্চর্য গলায় তার নাম ধ'রে ডাকছেন।

কিছুতেই সীমা তবু পেছনে ফিরবে না। ডাকও শুনবে না কিছুতেই। দারুণ ভয়টা এখন বেঁধে ফেলেছে সীমাকে।

সীমা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে, আনন্দবাবু দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভেঙে চৌচির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখে চশমা নেই ব'লে একপাও এগোতে পারছেন না।

সীমা আর কিছু ভাবতে পারলো না। বাইরে এসে সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সীমা অনুভব করলো, হামাগুড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ পর যখন সেই ভাঙা চশমাটা কুড়িয়ে নিয়ে চোখে দেবেন আনন্দবাবু, নিশ্চিতই তখন দেখবেন, বইয়ের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসা তাঁর পৃথিবী ভেঙে চৌচির হ'য়ে গেছে।

## পাপক্ষয়

শেষ রাত্রির হাল্‌কা অন্ধকার এখনও ছুঁয়ে আছে আকাশটাকে।

ভুবন একবার আকাশের দিকে তাকালো। হাল্‌কা অন্ধকারে তারা ফুটে আছে। এবার ফিরতে হবে। রেলপুল পেরিয়ে আধঘণ্টা হেঁটে তবে ময়নাডাঙার বাজার। তাড়াতাড়ি বাজারে পৌঁছুতে না পারলে ভালো দাম পাওয়া যায় না মাছের। বিক্রি শেষ হ'তে হ'তেও বেলা গড়িয়ে যায়।

জাল গুটিয়ে, মাছের ঝাঁকাটা কোমরের সঙ্গে ভালো ক'রে বেঁধে নিয়ে নদীর দিক থেকে ফিরে দাঁড়ালো ভুবন। পাড়ের দিকে চোখ রাখলো। আর সেই মুহূর্তে দেখতে পেলো, কাছাকাছি অন্ধকারে কেউ একজন দাঁড়িয়ে।

কে দাঁড়িয়ে ওখানে? চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও ভুবন নিজেকে সামলে নিলো। একটু যেন ভয়ই পেলো ভুবন।

যেখানে দাঁড়িয়েছিলো ভুবন, সেখানে দাঁড়িয়েই লোকটাকে চিনতে চেষ্টা করলো। অন্ধকারে মুখটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। লোকটার মোটাসোটা চেহারাই কেবল স্পষ্ট হ'য়ে আছে।

স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়েই আছে লোকটা। বোধহয় কিছু একটা মতলব আঁটছে মনে মনে।

এখানে ভুবনের কাছে টাকা পয়সা কিছু নেই। আছে কেবল একটা পুরোনো জাল আর কিছু মাছ। কারো এমন কিছু লাভ হ'বে না এসব নিয়ে।

তাহলে?

লোকটা কি ভুবনের কোনো ক্ষতি করতে এসেছে এখানে? এমনি জায়গায় এখন ভুবনকে যা খুশী তাই ক'রে যেতে পারে যে কেউ।

একটা সামান্য কিছুও হাতে নেই যা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে ভুবন।

দূর থেকেই ভুবন লোকটাকে ভালো ক'রে দেখতে চেষ্টা করলো। জলের একটানা শব্দে লোকটার চেহারাটাই যেন ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে।

না, এমনি চেহারার কোনো লোকের সঙ্গে ভুবনের শত্রুতা নেই।

যাক্‌গে, যা হবার হবে ভেবেই খানিকটা সাহসে ভর ক'রে হঠাৎ কয়েক পা এগিয়ে এলো ভুবন।

এগিয়ে এসেই চম্‌কে উঠলো। অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছেন নিবারণ দাস। এই মুহূর্তে একটা পাথরের মূর্তি ব'লেও বুঝি ভেবে নেয়া যায় তাকে।

বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিলো ভুবন। একটু ভয় তো হচ্ছিলোই ভুবনের। কোন্ লোকের মনে কি আছে কে জানে!

কিন্তু দাসমশাই এমনি ভোরের অন্ধকারে এখানে কেন?

টাকার জন্য? কিন্তু এমনি অন্ধকার-অন্ধকার ভোরে গ্রাম থেকে এতো দূরে দাসমশাই তো আসবার লোক নন! তাছাড়া এখানে তো আর টাকা থাকবে না ভুবনের সঙ্গে। দাসমশাই তা ভালো ক'রেই জানেন।

তাহ'লে?

ভুবন নতুন কিছু ভাবতে পারলো না।

থুক্ থুক্ ক'রে বার কয়েক কাশলেন দাসমশাই। থুথু ফেললেন শব্দ ক'রে। ভুবন স্থিরভাবে তাকিয়েই রইলো তার দিকে।

দাসমশাই পায়ে পায়ে কাছে এলেন। বিড়ি ধরালেন একটা। পাতলা অন্ধকারে দেশলাইয়ের আলোয় অদ্ভুত রকম নির্মম দেখালো তার মুখখানা।

'আপনি, হঠাৎ এখানে?' অবাক হ'য়ে শুধালো ভুবন।

সমস্ত দাঁত বের ক'রে হাসলেন দাসমশাই। বললেন, 'দেখতে

এলাম তোমার মাছ ধরা।'

ভুবন চোখ ছোটো ক'রে তাকালো দাসমশাইয়ের দিকে। বললো, 'শুধ্ মাছ ধরা দেখতে?'

'হুঁ। দেখি কি মাছ পেয়েছো—'

ভুবনের কোমরে বাঁধা ঝাঁকার ওপর ঝুঁকে পড়লেন দাসমশাই।

'কি আর মাছ পাবো আজকে! দেখছেন না নদীর অবস্থা। এতো জলে মাছ ধরা যায়—'

ভুবন নিজে একবার তাকালো নদীর দিকে। বর্ষার জলে ফুলে ফেঁপে টইটম্বুর হ'য়ে আছে নদী। ঢেউয়ের শব্দে ভ'রে উঠেছে চারদিক।

এতো জলে মাছ ধরা সত্যিই অসম্ভব।

শুধু উপায় নেই ব'লেই ভুবনকে আসতে হয়। শূন্য জাল টেনে তুলতে হয় বারবার।

'এখন তো বেশ কিছুদিন থাকবে এমনি। মানে গোটা বর্ষাকালটার কথাই বলছি।' দাসমশাই হঠাৎ বললেন।

ভুবন বললো, 'তা তো থাকবেই।'

'তাহ'লে আমার টাকাটার কিছু এখন শোধ দেবে কি ক'রে! অবশ্য টাকার জন্য আমি ভাবি না। টাকা মাটি, মাটি টাকা। কিন্তু—' অন্ধকারের মধ্যেও দাসমশাইয়ের উদাস চোখ দেখলো ভুবন।

'সত্যি দাসমশাই, আমার কাছে আপনার পাওনা টাকাটা শেষ পর্যন্ত মাটিই হ'য়ে যাবে বোধহয়।' ভুবন বললো মৃদুস্বরে।

একগাল হেসে দাসমশাই বললেন, 'না হে, তা হয় না। শোনো, আজ অনেক কষ্ট ক'রে এসেছি। তোমায় আজ কিছু দিতেই হবে।'

'কিছু মানে তো মাছ। নিয়ে যান—' ভুবন ঝাঁকাটা এগিয়ে ধরলো।

সে কথার উত্তর না দিয়ে দাসমশাই বললেন, 'তুমি তো ময়না-ডাঙার হাটে যাবে মাছ বিক্রি করতে?'

'হুঁ!' সতর্ক চোখে দাসমশাইয়ের দিকে তাকালো ভুবন।

'আজকের মাছ বিক্রির পুরো টাকাটাই আমায় দিয়ে দেবে। ওটা সুদের খাতেই যাবে আর কি। আমি আজ আর ছাড়ছি না। অভাব তোমার থাকবেই চিরকাল—'

'কিন্তু—' হঠাৎ খানিকটা অসহায়ভাবে ভুবন কিছু বলতে চাইলো।

'ছাখো হে, টাকা পয়সা এমন কিছু নয়। ও নিয়ে আমি কখনোই ভাবি না। কিন্তু তোমরা গরীব মানুষ, গত জন্মে পাপ করেছিলে, সুদে সে পাপের খানিকটা শোধ দিতে হবেই তোমাদের।'

ব'লে বিড়িটা দীর্ঘ ক'রে টানলেন দাসমশাই। লাল্‌চে আলোয় তাকে আরো নির্মম দেখালো।

ভুবন ফের কিছু এটা একটা বলতে চাইলো।

পারলো না। উত্তেজনায় শরীরটা বুঝি ফুলে উঠেছে। ক্ষ্যাপা ঘোড়ার মতো অস্থিরভাবে বালির মধ্যে পা ঘসলো ভুবন।

স্রোতের শব্দ হঠাৎ বাতাসে ভেসে উঠে আকাশ ছাপিয়ে দিলো যেন। ফের চোখ ছোটো ক'রে ভুবন তাকালো দাসমশাইয়ের দিকে। মনে হলো, রক্তের সঙ্গে যেন নদীর তোলপাড় স্রোত যোগ দিয়েছে। ভুবন ফের কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। শুধু ঘর্ ঘর্ ক'রে উঠলো গলার ভেতরটা।

বেশ কিছুদিন আগে মাছ ধরবার একটা বড়ো জাল কিনবার জন্য দাসমশাইয়ের কাছ থেকে কিছু টাকা সুদে ধার নিয়েছিলো ভুবন। বড়ো জাল না হ'লে মাছ ধরবার ভারি অসুবিধে। সবাই দরকার পড়লেই ধারের জন্য অবারিত হাত দাসমশাইয়ের কাছে যায়।

পুরো টাকাটার কিছু শোধ দিয়েছে ভুবন। সুদ দিয়েছে অনেক। বোধহয় আসলের চাইতেও বেশী। কিন্তু দিনকাল এতো খারাপ হ'য়ে উঠেছে ক্রমশঃ যে সুদ আর আসল ছ'টোর জন্যই দাসমশাইয়ের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ানো ছাড়া ভুবনের আর কোনো পথ নেই।

টাকা ধার নিয়ে যেন নিজের জন্যই একটা জাল কিনেছে ভুবন। শুধু ভুবনই নয়, সব্বাই তাই কেনে। মনে হয় ভুবনের।

আজ মরিয়া হ'য়ে দাসমশাই এসেছেন এখানে। বুঝতে পারছে ভুবন। ঝড়ের মতো শব্দে ভুবন একবার নিঃশ্বাস ফেললো। ফের পা ঘসলো বালিতে।

'চলো হে, তাড়াতাড়ি গেলে দামে বিক্রি হবে মাছগুলো।' দাস-মশাই তাড়া দিলেন।

'রেলপুলের ওপর দিয়ে যেতে পারবেন তো? রেলপুল ছাড়া কিন্তু ময়নাডাঙায় যাওয়া যায় না।' ভুবন বললো আস্তে আস্তে।

এক মুহূর্ত ভেবে দাসমশাই বললেন, 'তুমি তো আছো, শক্ত ক'রে আমার হাত ধরবে।'

'কিন্তু দাসমশাই, সত্যি বলছি, আজ একটা পয়সাও আপনাকে দিতে পারবো না। আজ আমার ভারি দরকার টাকার।' ভুবন বললো বিনীত গলায়।

বিরক্ত হলেন দাসমশাই। বললেন, 'ওসব কথা শুনতে কি এই ভোরে উঠে এসেছি? উঁহু, আসিনি।'

কয়েক মুহূর্ত কিছু ভাবলো ভুবন। একবার তাকিয়ে কেবল কাঠের স্লীপারে তৈরী রেলিঙহীন অন্ধকারে ডুবে থাকা বিশাল রেলপুলটা দেখতে চেষ্টা করলো। তারপর দাসমশাইয়ের দিকে ফিরে নদীর ভেতর থেকে উঠে আসা দম্‌কা বাতাসে নিঃশ্বাস নিলো বুক ভ'রে। বললো, 'আপনি তাহ'লে সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে ময়নাডাঙায় যাচ্ছেন?'

'না হ'লে এই ভোরে তোমাকে দেখতে এসেছে নাকি?' একটু যেন বিরক্ত হলেন দাসমশাই।

'বেশ তো, চলুন তাহ'লে।' ব'লে ভুবন রেলপুলের দিকে পা বাড়ালো।

বিড়িটা অনেকটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাসমশাই বললেন,

'ভেবেছিলাম আরো বেশী মাছ ধরবে আজকে।'

'মাছেরা তো জানে না, আপনি আসবেন। তাহ'লে যেচে এসে ধরা দিতো।' ঠাট্টা ক'রে বললো ভুবন।

দাসমশাই বোধহয় বুঝলেন না ঠাট্টাটা। ব্যস্ত গলায় বললেন, 'চলো, চলো, আর এখানে দাঁড়াবার কোনো দরকার নেই।'

ভুবন পা বাড়ালো রেলপুলের দিকে।

দ্রুত পায়ে হেঁটেই দাসমশাইকে সঙ্গে নিয়ে রেলপুলের গোড়ায় এলো ভুবন।

হাঁপাচ্ছেন দাসমশাই।

ভুবন পুলটার দিকে তাকালো। বিশাল একটা মইয়ের মতো প'ড়ে আছে। নীচে ঘোলা জলের প্রবল স্রোত বোঝা যাচ্ছে বেশ। শব্দ যেন ঝড়ের শব্দে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। পুলের শেষ মাথা ডুবে আছে অন্ধকারে।

দাঁড়িয়ে একবার রেলপুলটাকে দেখলেন দাসমশাই। ভুবন বুঝতে পারলো, দাসমশাই প্রবল ভয় পাচ্ছেন। কিন্তু লোভটা তার মনের মধ্যে যুদ্ধ করছে তার ভয়ের সঙ্গে। সত্যিই, রেলপুলটা পেরিয়ে যেতে ঠিক এই মুহূর্তে সাহসের দরকার আছে।

ভুবন মৃদুস্বরে বললো, 'ভয় পাচ্ছেন নাকি?'

'না না, ভয় কি!' ব'লে পা বাড়ালেন দাসমশাই।

'অবশ্য আমাদের পাপ ক্ষয় করাবার জন্য এটুকু আপনাকে করতেই তো হবে।' দাসমশাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে ভুবন বললো।

কথাটা শুনে ভুবনের দিকে তাকালেন দাসমশাই। 'হুঁ' ক'রে অদ্ভুত একটা শব্দ করলেন গলায়। তারপর ভুবনের হাতখানা শক্ত ক'রে ধ'রে অসম্ভব সাবধানে স্লীপারের ওপর পা ফেলে ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন রেলপুলের ওপর দিয়ে।

ফাঁকা স্লীপারের দিকে তাকালেই নীচে নদীর স্রোত চোখে

পড়ছে। যেন ভেসে যাচ্ছে রেলপুলটা। রেলিঙহীন পুল ব'লে নীচে তাকালে আরো বেশী ভয় হয়। মনে হয়, এই বুঝি পা স'রে গেলো স্লীপারের ওপর থেকে।

প্রথম দিন ভুবনও ভয় পেয়েছিলো। এখন প্রত্যেক দিন যেতে যেতে অভ্যেস হ'য়ে গেছে। চোখ বুঁজে এখন চলে যেতে পারে ভুবন।

ঝড় জল হ'লেও অসুবিধে হয় না। পুলের স্লীপারগুলো যেন মুখস্থ হ'য়ে গেছে। পা ফেললে স্লীপারের ওপরই যেন পড়বে পা।

দাসমশাই শক্ত ক'রে হাতখানা ধ'রে সোজা তাকিয়ে মেপে মেপে পা ফেলে হাঁটছেন। বোধহয় জানেন, নীচে তাকালেই অথবা পা একটু অসাবধানে বাড়ালেই সর্বনাশ। তার ভয়ই তাকে চেপে ধরবে।

ভুবন ইচ্ছে ক'রেই হঠাৎ কথা বলতে চেষ্টা করলো দাসমশাই-য়ের সঙ্গে। কিন্তু না, কিছুতেই কথা বললেন না দাসমশাই। ভুবনের হাতখানা তেমনি শক্ত মুঠোয় ধ'রে তেমনি মেপে মেপে পা ফেলে হাঁটতে থাকলেন স্লীপারগুলোর ওপর দিয়ে।

পুলের মাঝখানে পৌঁছেই হঠাৎ ভুবনের সমস্ত শরীর শক্ত হ'য়ে উঠলো। চারদিকে তাকিয়ে উত্তেজনায় বড়ো ক'রে নিঃশ্বাস নিলো বারকয়েক। দাসমশাইয়ের দিকে তাকালো। মাঝখানে এসে কেমন আড়ষ্ট হ'য়ে গেছেন দাসমশাই। যেন ভুবনকে জড়িয়ে ধরতে পারলে বেঁচে যাবেন। বোধহয় বুঝে ফেলেছেন, ময়নাডাঙা পর্যন্ত না এলেই হতো এমনিভাবে। বুঝে ফেলেছেন, ভুবনের পাপ ক্ষয় করাবার জন্য এভাবে আসা তার উচিত হয় নি।

সত্যিই, নদীতে ফুলে ওঠা জলের গর্জনে, বাতাসে আর অন্ধকারে ভয়াবহ হ'য়ে উঠেছে রেলপুলটা। ভুবনের মাথার ভেতরটা কি রকম যেন ক'রে উঠলো।

হঠাৎ 'দাঁড়ান দাস মশাই।' ব'লেই এক ঝট্‌কায় দাসমশাই-

-য়ের হাত থেকে হাতখানি খসিয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে অনেকটা দূরে এসে ঘুরে দাঁড়ালো ভুবন।

আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলেন দাসমশাই। মুহূর্তের মধ্যে উবু হ'য়ে ব'সে একটা স্লীপারকে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন।

'কি হলো ?' খ্যাপাটে গলায় শুধালো ভুবন। হাঁপাতে থাকলো ভীষণভাবে।

দাসমশাই কোনো উত্তর দিলেন না। মুখ তুলে কেবল তাকালেন ভুবনের দিকে। ভুবন তার চোখ-মুখ স্পষ্ট দেখতে পেলো না।

কিছুটা এগিয়ে এলো ভুবন।

'কি হলো দাসমশাই ?' ফের তেমনিভাবে শুধালো।

'তুমি আমায় বাঁচাও ভুবন।' দাসমশাই আর্তস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন আবার।

জলের ঝোড়ো শব্দের সঙ্গে দাসমশাইয়ের আর্তস্বর মিশে গিয়ে ভয়ংকর শোনালো বুঝি। ভুবন বুঝি চমকে উঠলো নিজেই।

নীচের অন্ধকারের মধ্যে ফুলে-ফেঁপে ভীষণ হ'য়ে ওঠা নদীটাকে অনুভব করলো ভুবন। তারপর দাসমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললো, 'এখুনি কিন্তু ভোরের ট্রেনটা যাবে পুলের ওপর দিয়ে —'

বিদ্যুতবেগে একবার পেছনটা দেখে নিলেন দাসমশাই। তারপর শব্দ ক'রে কেঁদে উঠলেন। দাসমশাইয়ের কান্নার শব্দ শুনতে ভারি চমৎকার লাগলো ভুবনের। হা-হা ক'রে ভুবনের হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো হঠাৎ।

আরো কাছে এলো ভুবন।

নদীতে প্রবল শব্দ হচ্ছে স্রোতের, বাতাস বইছে বেশ। একটা মেঘ বোধহয় ঘন হচ্ছে আকাশে। আরো শূন্যতা তৈরী হচ্ছে পুলের তলায়। দাসমশাই নীচের দিকে একবার তাকিয়ে আরো শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরলেন স্লীপারটাকে।

পৃথিবীর কোনো কিছুর বিনিময়েও বুঝি স্লীপারটাকে ছাড়বেন

না দাসমশাই।

কি ভেবে ভুবন ঘুরে দাঁড়ালো। পা বাড়ালো ওপারের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে 'ভুবন—', ব'লে হঠাৎ চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন দাসমশাই। বাতাসে দাসমশাইয়ের কান্না আরো চমৎকার শোনালো।

এবার হা-হা ক'রে হেসে ফিরে দাঁড়ালো ভুবন। ঘুরে কাছে এলো। বললো, 'বাড়িতে যাবেন?'

কান্না থামিয়ে এবার ফুঁপিয়ে উঠলেন দাসমশাই।

না, আর নয়। ভুবন মনে মনে ভাবলো। বললো, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা কাকে বলে দাসমশাই?'

দাসমশাই কোনো উত্তর দিলেন না। ঘোলাটে চোখে তাকালেন ভুবনের দিকে। ফের ফুঁপিয়ে উঠলেন।

'ট্রেনের শব্দ পাচ্ছি। চলুন, পাড়ে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। এখানে আপনাকে রেখে গেলে অবশ্য স্বর্গে যেতাম আমি। তা আমাদের জন্য স্বর্গের দরকার নেই। তাছাড়া আপনি গেলে ঈশ্বর আমাদের পাপ ক্ষয় করাবেন কাকে দিয়ে?'

দাসমশাই শিশুর মতো তাকিয়ে আছেন।

আরো কাছে এলো ভুবন। ঝুঁকে পড়ে বললো, 'নিন্, চলুন।'

দাসমশাই বুঝি বিশ্বাস করতে পারছেন না কিছু। হাসলো ভুবন। বললো, 'এবার আমায় বিশ্বাস করতে পারেন কিন্তু।'

ব'লে দাসমশাইয়ের একখানা হাত শক্ত মুঠোয় ধ'রে টেনে দাঁড় করালো দাসমশাইকে। তারপর সহজভাবে দাসমশাইকে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে শুরু করলো ভুবন।

দাসমশাই কোনো কথা বলছেন না। ফুঁপিয়েই যাচ্ছেন ক্রমাগতঃ।

ভুবন তার শক্তমুঠোর মধ্যে দাসমশাইয়ের হাতখানা ধ'রে হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করলো, এবার নিজের পাপ ক্ষয় করতে করতেই পাড়ের দিকে চলেছেন দাসমশাই।

সত্যযুগ ১৯৭৫

প্রতিধ্বনিকে নিয়ে খেলা শুরু হ'লো আমাদের। নদীর হাঁটুজল পার হ'য়ে এদিকে এসে সুভাষকে ডাকতে গিয়েই খেলাটাকে আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলো আলোক। আর সঙ্গে সঙ্গে আলোক, মনীষা এবং আমি পরস্পরকে চেঁচিয়ে ডাকতে শুরু করেছিলাম। দূরে নদীর ব্যারেজের কংক্রিটের দেওয়ালের গায়ে লেগে আমাদের কথা-গুলো ফিরে ফিরে আসছিলো। আমরা সবাই শৈশব আর কৈশোরকে বহুদিন অতিক্রম ক'রে এসেছি। তবু শৈশব আর কৈশোরের এই খেলা আমাদের মাতিয়ে তুলছিলো। আমি বেশী ক'রে মনীষার নাম ধ'রে ডাকছিলাম। আর সুবীর ডাকছিলো নিজেকেই।

হঠাৎ আলোক বললো, 'সুবীর কিন্তু নিজেকেই ডাকছে তখন থেকে।'

সুবীর বললো, 'এ্যাদ্দিনে নিজেকে ডাকবার একটা স্কোপ পেয়েছি, ডেকে যাচ্ছি তাই।'

সুবীর সহজভাবে কথাটা বললো বটে, আমরা কিন্তু খানিকটা সময় কথাটাকে নিয়ে ভাবলাম। ভাবতে ভাবতে মনে হ'লো, সুবীর সত্যি বলেছে। আমরা প্রায় কখনোই নিজেদের ডাকবার সুযোগ পাই না। আমাদের প্রয়োজন এতো বড়ো যে আমরা সেখানে ঢাকা প'ড়ে যাই। দেখতে পাই না নিজেদের। ফলে নিজেদের ডেকে যে সাড়া পেতে হয়, সে কথাটা মনে আসে না। কাজেই সুবীরের কথায় আমাদের প্রত্যেকের নিজের নাম ধ'রে ডাকবার দারুণ ইচ্ছে হ'লো। কিন্তু কেউ নিজেকে ডাকতে পারলাম না। সুবীর কিন্তু আরো অনেকটা সময় নিজের নাম ধ'রে ডাকলো।

হঠাৎ একসময় খেলাটা ভেঙে গেলো আমাদের। ওরা সবাই রূপালী বালির মধ্যে পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে হাঁটতে থাকলো। ওদের ছায়া খরস্রোতের মধ্যে থির্থির্ ক'রে কেঁপে চলতে থাকলো ওদের

পায়ে পায়ে। আমি আর মনীষা কিন্তু খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে ইচ্ছে ক'রে ব'সে পড়লাম বালির ওপর। ঝক্‌ঝকে বালির ওপর সুর্যের আলোর কণাগুলোকে গোনা যাচ্ছে না। আমি সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মনীষার মুখের দিকে তাকালাম।

মনীষা বললো, 'জায়গাটা যে এমন চমৎকার হবে, তা কিন্তু আমি ভাবতেও পারিনি সুধাময়।'

'আমিও ভাবতে পারিনি।' ব'লে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করলাম আমি।

জলের মধ্যে স্রোতের শব্দ উঠছে। ছোট ছোট তরঙ্গের মাথায় নেচে বেড়াচ্ছে রোদ্দুর। মাথার ওপর সমুদ্রের মতো আকাশ আমাদের অজস্র আনন্দের ভেতর ডুবিয়ে রেখেছে। আমি গভীর আলস্যে এসব লক্ষ্য করতে করতে সিগারেট ধরালাম একটা। কাঠিটা নিবিয়ে নদীর মধ্যে ছুঁড়ে দিতেই ছোট ছোট তরঙ্গগুলো তাকে নিয়ে মিলিয়ে গেলো।

সিগারেটের প্যাকেটটা পকেটে রাখবার আগে আমার অদ্ভুত একটা খেয়াল হলো। মনীষাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার হাত ব্যাগে ক্রীম আছে?

'শুধু ক্রীম কেন, সব আছে। আয়না, চিরুণী, এমনকি ডেটলের একটা শিশি পর্যন্ত।'

কথাটা ব'লে মনীষা হাসলো। মনীষার সঙ্গে আমিও হেসে বললাম, 'শুধু ক্রীম চাই, আর কিছু নয়।'

মনীষা হাত ব্যাগ খুলে ক্রীম বের করলো। আমি সিগারেটের প্যাকেটের রূপালী কাগজ একটুকরো নিপুণভাবে গোল ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম। তারপর ক্রীম দিয়েই টিপের মতো ক'রে সেই রূপালী কাগজের টুকরোটা পরিয়ে দিলাম মনীষার কপালে। রোদে ঝিকিয়ে উঠলো রূপালী কাগজের টিপটা। মনে হচ্ছে যেন মনীষাই ঝিকিয়ে উঠেছে।

মনীষা ব্যাগ থেকে আয়না বের ক'রে টিপটা দেখলো। তারপর হাসতে থাকলো।

'আমার কিন্তু সত্যি সত্যি ভালো লাগছে।' মনীষা বললো।

আমি সিগারেটের ধোঁয়া বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'ভাগ্যে আয়নাটা এনেছিলে! না হ'লে নিজের মুখ দেখতে পেতে না।'

'তাহ'লে নদীতে মুখ দেখে নিতাম।'

'এই স্রোতে মুখের ছায়া দেখা যায় না।'

'ব্যারেজের ওদিকটাতে দেখতাম। ওখানে স্রোত নেই জলে।'

'তা অবশ্য দেখতে পেতে।' আমি বললাম শেষ পর্যন্ত।

মনীষা হাসলো শুধু।

খানিকটা সময় তারপর নিঃশব্দে বসে থাকলাম আমরা। সুভাষরা এখন জলের ভেতরে পা ফেলে ফেলে হেঁটে যাচ্ছে। অনেকটা চলে গেছে ওরা। আর খানিকটা এগোলে ওদের আর দেখা যাবে না। কারণ ওখানে নদী বাঁক ঘুরেছে।

আমি মনীষার দিকে ফিরে বললাম, 'একটা গান শোনাও না।'

চোখ কপালে তুলে মনীষা বললো, 'এখানে! এখন!'

'এই তো গানের জায়গা।'

মনীষা স্থিরভাবে আকাশ, নদী, বালি, ওপারের ঝোপ ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত কি যেন ভাবলো। তারপর বালির ওপর হাত বোলাতে বোলাতে মৃদু গলায় একটা গান ধরলো। আমি জলের দিকে চোখ রাখলাম।

একটু পরেই আমার মনে হলো দ্বিতীয় একটা দুর্লভ স্রোত এবার বালির ওপর দিয়ে আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। এ স্রোতের সমাপ্তি আলোর মধ্যে, আকাশের মধ্যে। আমি ক্রমশঃ সেদিকে এগোলাম।

অনেকগুলো গান গেয়ে মনীষা যখন থামলো তখন সুভাষ সুবীরদের বাঁকের মুখে দেখা গেলো। ফিরে আসছে ওরা। আমি

আর মনীষা উঠে দাঁড়ালাম। ঝর্‌ঝর্‌ ক'রে রূপোর মতো কিছু বালি ঝ'রে পড়লো আমাদের জামাকাপড় থেকে। বালির ওপর যেখানে আমরা আধশোয়া অবস্থায় ছিলাম, সেখানে আমাদের ছাপ পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, আমরা খুব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসেছিলাম এতোক্ষণ।

ওরা আমাদের কাছাকাছি হ'তে এবার সবাই নদী পার হ'য়ে ওদিকে যাবার জন্য নেমে পড়লাম হাঁটুজল নদীতে।

নদী পার হ'য়ে খানিকটা হেঁটে আমরা সদ্য কৈশোরে পা দেয়া সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার নীচে এসে ঘাসের ওপর ব'সে পড়লাম। এখানে সরসী, দিবাকর আর নিখিলেশ বসেছিলো। উঁচুগলায় গল্প করছিলো ওরা।

সুবীর বললো, 'আমাদের চা চাই এবার। এতোক্ষণ ঘুরে চায়ের তেষ্টা পেয়েছে।

সুভাষ বললো, 'ঠাণ্ডাও লাগছে বেজায়। একটু চা খেলে গরম হওয়া যাবে।'

'চা আমাদের প্রায় হ'য়ে গেছে। ওদিকে তাকিয়ে দেখুন।' সরসী হেসে বললো।

গাছের তলায় স্টোভে সত্যি সত্যি চায়ের জল গরম হচ্ছে।

'তোমাদের ডাকবার জন্য এক্ষুনি হাঁক দিতাম। সরসীর চা ঢালবার অপেক্ষায় ছিলাম কেবল।' দিবাকর বললো।

সরসী উঠে স্টোভের কাছে গিয়ে রুমাল দিয়ে কেটলির মুখ খুলে চা ঢেলে দিলো তার মধ্যে। মনীষা এগিয়ে গিয়ে গোছাতে লাগলো।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই চা আর কেক দিয়ে গেলো সরসী আর মনীষা।

চায়ে চুমুক দিয়ে বেশ ভালো লাগলো আমার।

চা খাওয়া শেষ হতেই আবার সবাই উঠে পড়লাম। আজ সারা-

দিন যেন ছুটে ছুটে বেড়াবার কথা নিয়ে এখানে এসেছি আমরা। চায়ের জন্য উদগ্রীব হয়েছিলাম সবাই, কিন্তু সে কথাটার জন্যই এক নিঃশ্বাসে সবাই চায়ের কাপ খালি করেছি।

মনীষা আর আমি এবার ব্যারেজের এদিকে এলাম। গভীর নীল জল থম্‌কে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। জলের পাশে রেলিঙের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালাম আমরা। নীচে অনেকগুলো সিঁড়ি ধাপে ধাপে নেমে জলের মধ্যে ডুবেছে। একটা নৌকো রেলিঙের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা। লম্বা শেকলটা ডুবে আছে জলের মধ্যে। টলটলে জলের ওপর নৌকোটাকে ছবির মতো মনে হচ্ছে।

খানিক আগে সূর্য বেশ উজ্জ্বল ছিলো। এখন অনেক খানি ম্লান হ'য়ে গেছে। বিকেলের দিকে ঢলে পড়ছে বেলা। আমি জলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মনীষার মুখের দিকে তাকালাম। ওর কপালে রূপালী টিপটা তেমনি আছে। ম্লান আলোর জন্য তেমন ক'রে ঝিকিয়ে উঠছে না শুধু।

মনীষা উজ্জ্বল লাল রঙের কার্ডিগানটা পরেছে। আমিও কোটটা চাপিয়েছি গায়ে। তবু বেশ শীত করছে আমার।

আমরা পাশাপাশি রেলিঙের ওপর ঝুঁকে নৌকো, জল, পাখী, রোদ্দুর এইসব নিয়ে খুব মৃদু গলায় গল্প করছিলাম। দিবাকর, সুবীর, সরসীরা নদীর দিকে মুখ করা ডাকবাংলোর বারান্দায় ব'সে উঁচু গলায় গল্প করছে আর হাসছে। ডাকবাংলোর প্রাঙ্গনে অজস্র ফুলগাছ ওদের খানিকটা আড়াল ক'রে রেখেছে। তার মধ্য দিয়ে ওদের অত্যন্ত সজীব আর সুখী মনে হচ্ছে। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমাদের গাড়ীটা মাঠের কোণ ঘেঁসে ফুল বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ীটাকেও অত্যন্ত সুখী আর সুন্দর মনে হ'লো আমার।

মনীষা মৃদুস্বরে বললো, 'জায়গাটা ভারি সুন্দর কিন্তু।'

আমি হেসে বললাম, 'সত্যি।'

'নৌকোটা যদি শেকলে বাঁধা না থাকতো, তাহলে বেশ হতো। খানিকটা ভেসে বেড়ানো যেতো। ভেসে বেড়াতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে সুধাময়।' হঠাৎ কি ভেবে যেন বললো মনীষা।

রোদের মধ্যে পরিচ্ছন্ন একটা বিকেলের রঙ লেগেছে। আমি লক্ষ্য করলাম এবার। আরো মনোরম লাগছে চারদিক। দিবাকর-দের হাসির শব্দ জলের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। জলকে আরো অথৈ আর অপরিচিত মনে হ'লো আমার।

মনীষার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তোমার মতো আমারও নৌকোয় ভেসে বেড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'নৌকোটা খুলে নেয়া যায় না ?' মনীষা মৃদুস্বরে শুধালো।

'না, গভর্নমেণ্টের নৌকো। আগে অর্ডার করিয়ে আনতে হয়।' মনীষার একখানি হাত ছুঁয়ে বললাম আমি।

জলের রঙ ক্রমশঃ কালো হ'য়ে উঠেছে। নির্জন আর বিষণ্ণ দেখাচ্ছে নৌকোটাকে। একরাশ পাখী আকাশ ভ'রে ডাকতে ডাকতে ব্যারেজের উঁচু রেলিঙগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে।

মুগ্ধ চোখে তাদের আকাশের মধ্যে মিশে যেতে দেখলাম আমি। মনীষাকে দেখলাম তারপর।

মনীষা আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ফের নৌকোর দিকে রাখলো। ওর কপালের রূপালী কাগজের টিপটাকে খানিকটা সাদা মনে হচ্ছে এখন।

খুব নীচু গলায় মনীষা একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে শুরু করলো। গোধূলির আলোয় গানের সুরটুকু রমণীয় হ'য়ে উঠলো মুহূর্তে। মনে হ'লো, মনীষা গান গাইতে গাইতে হাল্‌কা হ'য়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। নদী ভাবলে মনীষা নদী হবে, পাখী ভাবলে পাখী, ফুল ভাবলে ফুল—যা ভাববো মনীষা তাই হ'য়ে যাবে।

হাতের মুঠোয় আমি মনীষার একখানা হাত তুলে নিলাম।

তারপর খানিকক্ষণ আগে আকাশের মধ্যে মিশে যাওয়া পাখীদের

পথের রেখা ধ'রে মিলিয়ে গেলাম আকাশের সুদূর নির্জনতায়।

কতোক্ষণ পর আমার মনে পড়লো না, দেখলাম মনীষার কপালে রূপালী কাগজের টিপটা ঝল্‌মল্‌ ক'রে উঠেছে। বিস্মিত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বিরাট একটা চাঁদ উঠেছে আকাশ জুড়ে।

জ্যোৎস্নার ভেতর নৌকোটা স্থির হ'য়ে আছে। পাশেই ডুবে আছে চাঁদ। নৌকোর দিকে তাকিয়ে আমি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলাম। মনীষাও সেদিকে তাকালো।

খানিক পরে মনীষা বললো, 'নৌকোটা যদি খোলা থাকতো!'

আমি বললাম, 'চলো না, বাঁধা নৌকোর ভেতরই খানিকটা সময় ব'সে থাকি। হয়তো বসলেই বাঁধনটাকে ভুলে যাবো।'

মনীষা হঠাৎ উৎসাহিত হ'য়ে বললো, 'বসবে নৌকোর ভেতর? চলো তাহলে।'

দু'জনে রেলিঙ টপ্‌কে সিঁড়ি দিয়ে তর্‌তর্‌ ক'রে নেমে জলের কাছে চলে এলাম।

জলের মধ্যে আমাদের ছায়া ডুবলো। নৌকোটাকে আমি আরো কাছে নিয়ে এলাম। মনে হচ্ছে, আমরা যেন অনেক দূরে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। জল ন'ড়ে উঠেছে। চাঁদটা টল্‌মল্‌ ক'রে উঠছে জলের ভেতর। এতোক্ষণের নিস্তরঙ্গ জল ন'ড়ে ওঠায় আমার আশ্চর্য লাগছে। মনীষার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'উঠে পড়ো।'

মনীষা তার শাড়ি সামান্য উঁচু ক'রে অত্যন্ত সাবধানে আমার কাঁধে ভর দিয়ে নৌকোয় উঠলো। টলে উঠলো নৌকো। মনীষা ভয়-ভয় গলায় ব'লে উঠলো, 'ডুবে যাবে নাতো?'

আমি হেসে বললাম, 'উঁহুঁ, ডুববেনা। জলের ওপর নৌকো টল্‌মল্‌ করবেই।'

আমি এবার উঠে পড়লাম নৌকোয়। আর একবার টলে উঠলো নৌকো। মনীষা তাড়াতাড়ি একদিকে ব'সে পড়লো। বললো, 'কী

দুলছে নৌকো। বাব্বা। তুমি সাঁতার জানো তো?'

'উঁহুঁ।'

'নৌকো যদি উল্টে যায়?' ভয়-ভয় গলাতেই বললো মনীষা।

আমি বললাম, 'এ নৌকো উল্টে যাবার ভয় নেই।'

আমার কথায় ভরসা পেলো মনীষা। কিন্তু তীরের গা ঘেঁসে এইরকম-ভাবে ব'সে থাকতে ইচ্ছে হলো না আমার। কাজেই ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে একটা সিঁড়িতে হাত ঠেকিয়ে আমি নৌকোটাকে ঠেলে দিলাম জোরে। একটা টাল খেয়ে নৌকোটা ক্রমাগতঃ তীর থেকে সরতে থাকলো। ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে শেকলটার শব্দ বাজলো জলের মধ্যে। চারদিক জ্যোৎস্নার মতো নিঃশব্দ আর মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠলো যেন।

ভয়ে খানিকটা ঝুঁকে প'ড়ে মনীষা বললো, 'কি হচ্ছে! অনেকটা চ'লে এলাম যে!'

'তাইতো চাচ্ছিলাম মনে মনে!' আমি সহজ গলায় বললাম।

মনীষা বললো, 'আমিও বোধহয় মনে মনে তাই চাচ্ছিলাম!'

ব'লে এবার আশ্চর্য চোখে হাসলো।

শেকলটা বেশ খানিকটা লম্বা। কাজেই তীর থেকে অনেকটা চ'লে এসেছি আমরা। শেকলে টান পড়ায় নৌকো থেমে গেছে। আমরা কেউ নড়ছি না ব'লে নৌকোটাও স্থির হ'য়ে রইলো।

মনীষা মৃদুস্বরে বললো, 'খুব ভালো লাগছে, না!'

আমি বললাম, 'হুঁ।'

মনীষা বললো, 'মাঝখানে পৌঁছুতে পারলে আরও ভালো লাগতো।'

আমি মনীষার দিকে তাকালাম। ওর কপালের রূপালী টিপটাই চোখে পড়লো। জ্যোৎস্নায় অসম্ভব উজ্জ্বল দেখাচ্ছে টিপটা। মনীষার ইচ্ছেটাকেও ওইরকম উজ্জ্বল মনে হলো।

'শেকলটা খোলা যায় না?' নীচু গলায় বললো মনীষা। মনীষার গলায় একটা আর্তি প্রকাশ পেলো।

আমি মনীষার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'না।'

ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে হাসি আর উঁচু কথা ভেসে এলো জলের ওপর দিয়ে। নৌকোয় ব'সে সেই শব্দ আমার বিচিত্র লাগছে। মনে হচ্ছে, আমরা দ্বিতীয় একটা পৃথিবীতে বাস করছি।

মনীষা বললো, 'শেকলটাকে সত্যি সত্যি আমার বন্ধন মনে হচ্ছে। নাহ'লে বুঝি আমাদের মুক্তি হতো। তীরের বন্ধন থেকে মুক্তি।'

মনীষা কিছুটা আত্মগতভাবে কথাগুলো বললো ব'লে আমি কোনো কথা বললাম না। জলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে হাল্কা একটা বাতাস আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে আমার। তবু একটা আশ্চর্য ভালোলাগা আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো।

বেশ খানিকটা সময় কেটে গেলো। নিঃশব্দে ব'সে তার অচেনা এই পৃথিবীকে দেখলো মনীষা। একটিও কথা বললো না। মনীষার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো, মুক্তি কথাটাকে খুব ভাবছে মনীষা। বন্ধন সত্যি সত্যি যেন প্রাচীর হ'য়ে আমাদের মুক্তিকে আড়াল ক'রে রেখেছে।

প্রাচীরটা এতো শক্ত যে, মনীষা তাকে টলাতে পারছে না।

আমি জ্যোৎস্নায় ঘড়ি দেখলাম। রাত বেড়ে যাচ্ছে। মনীষাকে বললাম, 'এবার আমরা তীরে ফিরবো। আমাদের তো আবার বাড়ী ফিরতে হবে!'

মনীষা বললো, 'চলো।'

কিন্তু ফিরবো কি ক'রে? নৌকোটাকে তীরের দিকে নিয়ে যেতে হ'লে বৈঠা চাই। আমি নীচু হ'য়ে নোকোর মধ্যে বৈঠা খুঁজে দেখলাম। না, নৌকোর মধ্যে সে সব কিছু নেই। একহাত দিয়ে জল ঠেলে ফেরা যায়। কথাটা ভেবেই আমি দ্রুত হাত গুটিয়ে সরে এসে জলের মধ্যে হাত বাড়াতে নীচু হ'তেই নৌকোটা ভয়ঙ্করভাবে টল্‌মল্‌ ক'রে উঠলো।

মনীষা ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'নৌকোটা ডুবে যাবে সুধাময়। তুমি স'রে এসো।'

'উঁহু, ডুববে না।' মনীষার দিকে ফিরে আমি বললাম।

আমাকে প্রায় আঁকড়ে ধরলো মনীষা বললো, 'না না, অন্যভাবে ফিরতে হবে। এভাবে নৌকোটা দুলে উঠলে আমার ভীষণ ভয় করে।'

মনীষা আমাকে কিছুতেই জলে হাত নামাতে দিলো না। কপালে ঠাণ্ডার ভেতরও বুঝি বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো আমার। স'রে এসে স্থির হ'য়ে ব'সে রইলাম আমি। নৌকোটা দুলে দুলে স্থির হলো।

ঠাণ্ডায় আমরা কাঁপছি। জ্যোৎস্নাটাও কেমন ঘোলাটে হ'য়ে উঠলো। ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে দিবাকরদের কারো কথা ভেসে আসছে না। চারদিক এতো নির্জন হ'য়ে উঠেছে যে তার মধ্যে আমরা যেন পাথর হ'য়ে যাবো।

ঘোলাটে জ্যোস্নায় আমি মনীষার দিকে তাকালাম।

মনীষা ভয়ার্ত গলায় বললো, 'কি ক'রে এবার মুক্তি পাই বলো তো?'

আমি শিথিল গলায় বললাম, 'জানি না।'

আসলে আমি অসম্ভব অসহায় বোধ করছি। ডাকবাংলো থেকে ওদের কণ্ঠস্বর শুনবার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করলাম।

মনীষা হঠাৎ আশ্চর্য গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'সুধাময়!'

চমকে উঠে বললাম, 'কি হলো?'

'একটা কাজ করো সুধাময়, হাত বাড়িয়ে নৌকোর মাথায় বাঁধা শেকলটা ধরো। শেকল ধ'রে ফিবে যাওয়া যাবে। কথাটা এতোক্ষণ আমাদের মনেই হয়নি।' মনীষা হাঁপাতে থাকলো।

মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে আমি শেকলটা ধরলাম। সমস্ত শরীর উত্তেজনায় কেঁপে উঠছে! বরফের মতো ঠাণ্ডা লোহার শেকলটাও

যেন উত্তপ্ত মনে হচ্ছে আমার!

একবার মনীষার মুখের দিকে তাকিয়ে সাবধানে গুটিয়ে আনতে থাকলাম শেকলটা। ক্রমশঃ কাছে আসতে থাকলো তীর।

আমার পিঠের ওপর ঝুঁকে আছে মনীষা। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে প্রবলভাবে। মনীষার নিঃশ্বাস আমার গালে অনুভব করছি।

মনীষা যাকে বন্ধন বলেছিলো, মনীষা নিজেই তাকে মুক্তি ব'লে চিনেছে, আমাকে চিনিয়েছে। আমি বুঝি আর কিছু ভাবতে পারছি না।

আমাদের দু'জনকে নিয়ে নৌকোটা তীরের দিকে চলেছে আস্তে আস্তে। মৃদু শব্দ উঠছে জল থেকে। শেকলের শব্দ বেজে যাচ্ছে একরাশ ঘুঙুরের মতো।

ফের মনীষার দিকে তাকালাম আমি। ভয় থেকে উঠে আসা মনীষাকে জ্যোৎস্নায়, জলের শব্দে, নির্জনতায় আশ্চর্য সুন্দর দেখাচ্ছে।

ডাকবাংলোর বারান্দা থেকে ওদের হাসি এতোক্ষণে জলের ওপর দিয়ে নৌকোর গায়ে এসে আছড়ে পড়লো।

বেড়ার ওপর ঝুঁকে প'ড়ে তারাপদকে ডাকলো সুধন্য।

ঘরের কিছু কাজ করছিলো তারাপদ। সুধন্য ডাকতেই ফিরে সুধন্যকে একবার দেখলো। বললো, 'তুই চলে যা সুধন্য, আমি এখুনি যাচ্ছি।'

সুধন্য বললো, 'তাড়াতাড়ি আসিস কিন্তু!'

'আচ্ছা।' তারাপদ মৃদুস্বরে বললো।

আর দাঁড়ালো না সুধন্য। দ্রুতপায়ে চলে গেলো।

সুধন্যর ডাকের জন্যই অপেক্ষা করছিলো তারাপদ। ব্যস্তভাবে কাজের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে উঠে পড়লো। মালতীর দিকে তাকালো তারপর।

উঠোনে ধান ছড়িয়ে দিয়েছে মালতী। রোদ এখন উঠোন জুড়ে। ধানের ওপর রোদ প'ড়ে সোনার মতো মনে হচ্ছে। ধান ছড়িয়ে দেবার একটা শব্দ জেগে উঠছে উঠোন ভ'রে। অসম্ভব মৃদু অথচ অসম্ভব ভালো লাগা সেই শব্দ। পাখীর ডাকের সঙ্গে সেই শব্দ মিশে যাচ্ছে। একদল চড়ুই নেচে বেড়াচ্ছে উঠোনের ওদিকের চালের ওপর। একটু পরেই ওরা উঠোনে নামবে।

বারান্দার দিকে সরে এলো তারাপদ। একটু ক্লান্ত লাগছে বুঝি। একটা হাই তুললো বড়ো ক'রে। উঠোনে ছড়ানো ধান-গুলোর দিকে তাকালো। মালতী এখন ঝুঁকে ব'সে ধানগুলো হাত দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মালতীর হাতের লাল শাঁখায় রোদ্দুর। রোদ্দুর ধানের ওপর। তারাপদর চোখ বুঝি ধাঁধিয়ে গেলো।

একটু সময় মালতীকে দেখলো তারাপদ। ধানগুলোকে দেখলো।

মালতীর ধান শুকোবার উঠোন ক্রমশঃ ছোটো হ'য়ে যাচ্ছে তারাপদর চোখের সামনে। তারাপদ জানে, এই ক্রমশঃ ছোটো হ'তে

থাকা উঠোন একদিন বিন্দুর মতো হ'য়ে যাবে। মিলিয়ে যাবে তারপর। তারাপদ তাকে রক্ষা করতে পারবে না কিছুতেই।

সত্যিই, ক্রমশঃ হেরে যাচ্ছে তারাপদ।

ধার-দেনা পাপের মতো লক্ষ হাতে জড়িয়ে আছে। পাপক্ষয় হচ্ছে সুদে। সুদ নেবার সময় কথাটা বলে নিশিকান্ত। এর উত্তর তারাপদর কাছে নেই।

এ জীবনে এই একটা কথার উত্তর বোধহয় আর যোগার করতে পারবে না তারাপদ।

ইদানীং তাই একটা হতাশা ঢেকে ফেলেছে তারাপদকে। সুধন্যর কেনা খাসীটা কাটবার ভারটা তাই ইচ্ছে ক'রেই নিয়েছে। মনের ভেতরের একটা ছট্‌ফটে যন্ত্রণাকে কিছুটা অন্ততঃ মুক্ত ক'রে দিতে পারবে, মনে মনে ভেবেছে তারাপদ।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে তারাপদ বারান্দায় উঠে এলো।

বারান্দার বেড়ার গায়ে আটকানো ছিলো দা খানা। সে দিকে তাকালো তারাপদ। দা খানা রূপোর মতো ঝক্‌ঝক্ করছে! হাত বাড়িয়ে সেখানা নিয়ে নিলো তারাপদ। শির্‌শির্ ক'রে উঠলো সমস্ত শরীর। ভয় ভয় একটা উত্তেজনাও অনুভব করলো বুকের ভেতরে।

গতকাল রাতে দেড় ছ'ঘণ্টা ধ'রে ঘষে ঘষে দা খানায় শান তুলেছে তারাপদ। নদী থেকে ব্যাগে ক'রে বালি এনেছিলো সে জন্য। শান তুলতে তুলতে রীতিমতো ঘামিয়ে গিয়েছিলো। কুপীর লালচে কাঁপা আলোয় দায়ের শান বোঝা যাচ্ছিলো না রাত্রে। মালতী শুধু ভয়ে ভয়ে দেখছিলো ব্যাপারটা। জিজ্ঞেসও করেছিলো কিছু। তারাপদ উত্তর দেয়নি। বেড়া বাঁধবার কাজ থাকলেও এমনি যত্নে কখনও শান তোলে না তারাপদ। কাজেই ব্যাপারটা মালতীকে একটুখানি ভয় তো পাওয়াবেই।

মালতীর শীর্ণ মুখে ভয়টাকে কুপীর লালচে আলোয় অদ্ভুত

দেখাচ্ছিলো।

দিন পনেরো আগে সুধন্য একটা খাসী কিনেছে। বিরাট খাসী।

জমি নিয়ে সুধন্যর সঙ্গে হৃষীকেশ সামন্তর জেলা কোর্টে জোরদার মামলা চলেছিলো কয়েক বছর ধ'রে। সেই মামলায় খরচ সহ সুধন্য জিতেছে। যেদিন মামলার রায় বেরিয়েছে, সেদিনই হাট ঘুরে খাসী কিনে ফিরেছে সুধন্য। গ্রামের কিছু মানুষ, যারা সাক্ষী দিয়েছে তার পক্ষে,মামলায় জিতলে তাদের খাসী খাওয়াবার কথাই দিয়েছিলো সুধন্য।

ক'দিন ধ'রে আর কারো সময় হচ্ছিলো না। দিব্যি সুধন্যর বাগানের ঘাস খেয়েছে খাসীটা। গতকাল বিকেলে সুধন্য খাসীটাকে কাটবে ব'লে আজকের দিনটাকেই ঠিক করেছে। খাসী কাটবার ভার যেচেই নিয়েছে তারাপদ। মালতীকে এ সম্পর্কে অবশ্য কিছু বলেনি।

খাসী কাটবার কথা শুনলে মালতী বাধা দেবেই। তারাপদ জানে।

মালতীর কোথায় যে দুর্বলতা, বুঝতে পারে তারাপদ। মালতী জেনে গেছে, তার ঘরে কোনোদিন কোনো শিশুর পায়ের ছাপ পড়বে না। শহরের হাসপাতালের বড়ো ডাক্তারই সে কথাটা বলেছেন শেষ-পর্যন্ত। সেই থেকেই যে কোনো নিষ্ঠুরতায় মালতী ভয় পায়।

তারাপদ সব বুঝতে পারে. দুঃখও হয় মালতীর জন্য। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তারাপদর বুকের ভেতর কিছু সুখ এনে দেবে। কার ওপর যেন একটা অক্ষম আক্রোশ জমা হয়ে আছে। সেই আক্রোশটাই কিছুটা মুক্তি পাবে আজ।

এসব ভাবতে ভাবতে দা খানা নিয়েউঠোনে নামলো তারাপদ।

মালতী দা খানার দিকে তাকিয়ে থাকলো, কিছু শুধালো না।

'সুধন্য ডেকে গেলো—ওর ওখানে একটু কাজ ক'রে আসি।' অবলীলায় ব'লে ফেললো তারাপদ। যেন কৈফিয়ৎ দিলো।

দা খানার গায়ে রোদ পড়েছে। ঝক্ঝক্ করছে দা খানা। মালতী

সেদিকে তাকিয়েই ভয়-ভয় গলায় বললো, 'খারাপ কিছু কাজ না তো?'

'না—' ব'লে আর কোনো প্রশ্ন করবার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে পড়লো তারাপদ।

বেরিয়েই বুঝতে পারলো, মালতী ঠিক যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারেনি তার উত্তরে। না হ'লেও ক্ষতি নেই তারাপদর। কারণ সত্যি সত্যি তো সে কোনো খারাপ কাজ করতে যাচ্ছে না—খাসী কাটবার কথা শুনে একটুখানি রাগ করবে, এইটুকুই!

একবার পেছন ফিরলো তারাপদ।

মালতী বেড়ার গা ঘেঁষে ওঠা সুপুরী গাছটার নীচে দাঁড়িয়েই আছে। ভারি করুণ দেখাচ্ছে মালতীকে।

মুহূর্তে চোখ ফিরিয়ে হাঁটতে থাকলো তারাপদ।

পুরোনো একটা গাছের গুঁড়ির ওপর ব'সে সুধন্যরা কথা বলছে। গাছের ছায়া ঘন হ'য়ে আছে ওদের মাথার ওপর। ওদিকে চালা ঘরের নীচে খাসীটা খুঁটে খুঁটে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে। দিব্যি চমৎকার খাসীটা। সুধন্য সত্যিই খাসীটাকে দেখে-শুনে কিনেছে। যে কঠিন মামলায় জিতেছে সুধন্য, তাতে এমনি খাসীই কেনা উচিত। তারাপদ ভাবলো। দা-খানাকে দেখলো একবার।

'এসো হে—' তারাপদকে দেখে ব'লে উঠলো সুধন্য।

ছায়ার নীচে এসে দাঁড়ালো তারাপদ।

কেশব তারাপদর হাতের দা-য়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'দা-খানা নতুন মনে হচ্ছে?'

'উহুঁ, শান দিয়েছি। যা খাসী কিনেছে সুধন্য, দা-য়ে ধার না দিলে চলে?' কথাটা ব'লে গুঁড়ির একপাশে ব'সে পড়লো তারাপদ।

সুধন্য সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলো তারাপদর দিকে।

তারাপদ আরাম ক'রে একটা সিগারেট ধরালো। সবাইকে দেখলো একবার। সুবল দা-খানা নিয়ে ধার পরীক্ষা করছে। পা

ঝুলিয়ে মুঠো ক'রে সিগারেটটাকে টেনে যাচ্ছে সুধন্য। কেশব গুন-গুন ক'রে গানের সুর ভাঁজছে একটা।

'যা শান তুলেছো দা-য়ে, তাতে এক কোপে মানুষ-টানুষও কাটা যাবে কিন্তু।' হঠাৎ তারাপদর দিকে তাকিয়ে সুবল বললো। দা-খানা দিয়ে দিলো তারাপদর হাতে।

তারাপদ বললো, 'তা যাবে।'

সুধন্য বললো, 'খাসীর সঙ্গে মানুষের কিছু তফাত আছে নাকি? নইলে, হৃষিকেশ সামন্তটা অমনি একটা মিথ্যে মামলা করে জমি নিয়ে?'

'বরং সামন্ত তোমায় পাঁঠা ভেবেছিলো। নেহাত কেসের কোপটা ঠিকমতো পড়েনি।' ব'লে হো হো ক'রে হেসে উঠলো তারাপদ।

এবং ঠিক তেমনিভাবেই হেসে উঠলো আর সবাই।

'নাও, ওঠো, বেলা বাড়ছে—' তারাপদ হঠাৎ-ই একটুখানি উত্তেজিতভাবে ব'লে উঠলো।

'দাঁড়াও, মুড়ি-টুড়ি আসছে। চা আসছে। খেয়ে নিই। খাসীটাকে তৈরী করতে আবার অনেকটা সময় লাগবে।' সুধন্য বললো।

সুতরাং ওঠা হ'লো না তারাপদর।

খাসীটার দিকে তাকালো তারাপদ। দিব্যি আপনমনে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে খুঁটে খুঁটে।

অন্যমনস্কভাবে তারাপদ শুধু দা-য়ের ধারটা একবার পরীক্ষা ক'রে নিলো।

মুড়ি চা খেতে খেতে আর গল্প করতে করতে বেশ জমে উঠলো আড্ডাটা। মুড়ি আর চা শেষ হ'তেও গল্প শেষ হলো না।

হঠাৎ সুধন্যই উঠে দাঁড়ালো। শব্দ ক'রে হাই তুললো একটা। বললো, 'চলো হে—'

ব'লে এগিয়ে গেলো খাসীটার দিকে। তারাপদও উঠলো।

শেষবারের মতো বুঝি দা-য়ের ধারটুকু পরীক্ষা ক'রে নিলো আঙুলে।

'তুমি তো এই প্রথম এতো বড়ো একটা খাসী কাটবে?' সুবল শুধালো।

তারাপদ বললো, 'হ্যাঁ।'

'কাটতে পারবে তো?' কেশবের গলায় একটু ঠাট্টার সুর।

তারাপদ কেশবের দিকে তাকালো। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'খাবার জিনিস হ'লে মানুষ-টানুষও কাটা যায়।'

'কোথায় কাটবে? এখানেই?' খাসীটার গলার দড়ি হাতে নিয়ে শুধালো সুধন্য।

মৃদুস্বরে তারাপদ বললো, 'এখানেই তো কাটা হবে।'

বেশ উত্তেজনা হচ্ছে তারাপদর। খাসীটার দিকে ভালো ক'রে তাকালো। রীতিমতো আঁট-সাঁট চেহারা। সাত-আট কেজি মাংস হবে নিশ্চয়ই। এতো বড়ো একটা খাসী কাটার ভার নেয়া বোধহয় উচিত হয়নি। তারাপদ যেন খানিকটা দুর্বল হ'য়ে গেলো।

বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিলো তারাপদ। দা-খানায় বেশ ধার হয়েছে। ভাবতে চেষ্টা করলো, অবলীলায় সে কাটতে পারবে খাসীটাকে।

'ধরবে কে খাসীটাকে?' সুবল শুধালো।

সুধন্য বললো, 'তুই আর আমি ধরবো।'

সুবল একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললো, 'বরং কেশব ধরুক—'

এগিয়ে গেলো কেশব।

খাসীটা কিছু একটা বুঝেছে বোধহয়। ঘাড় উঁচু ক'রে মৃদুস্বরে ডাকলো একবার। তারপর সামনের পাটাকে মাটির ওপরে ঠুকে তারাপদদের দেখলো।

কেশব এগিয়ে গিয়ে ধরলো খাসীটাকে।

'নে শুইয়ে ফেলি—' ব'লেই অতো বড়ো খাসীটাকে সুধন্য অদ্ভুতভাবে চিত ক'রে শুইয়ে দিলো এক মুহূর্তে। খাসীটার পেছন

দিকটাকে সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরলো কেশব। আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলো খাসীটা।

তারাপদ তাকিয়ে দেখলো খাসীটাকে। উঠে পড়বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে খাসীটা। সমস্ত শরীর তার পাকিয়ে উঠছে ছু'জনের হাতের মধ্যেই। নিঃশ্বাসের শব্দ বুনো জন্তুর নিঃশ্বাসের শব্দের মতো মনে হচ্ছে যেন।

উত্তেজনায় এবার অধৈর্য হ'য়ে উঠলো তারাপদ। দা-খানাকে চোখের সামনে তুলে ধরলো।

এক্ষুনি এগিয়ে গিয়ে শক্ত মুঠোয় দা-খানাকে ধ'রে খাসীটার গলার ওপর টেনে দেবে, ব্যস। মনে মনে তারাপদ নিজেকে শক্ত করলো।

'কি হ'লো তারাপদ, আয়—' সুধন্য ডাকলো তারাপদকে।

এগিয়ে এলো তারাপদ। খাসীটার গলার যে জায়গাটাতে দা চালাবে, সে জায়গাটা ঝুঁকে দেখলো। রৌদ্রে খাসীটার লোমগুলো যেন চক্‌চক্‌ করছে। সত্যি, খাসীর মতো একটা খাসী কিনেছে সুধন্য।

বাঁ হাত বাড়িয়ে খাসীর মুখটা মুঠোয় ধ'রে টেনে গলাটাকে আরো টান টান ক'রে নিলো তারাপদ। দা-খানা রাখলো গলার ওপর। ক্রমশঃ শক্ত হ'তে থাকলো তার মুঠো।

'নাও, দা-খানা এবার গলার ওপর টেনে দাও জোরে—' কেশব বললো।

'দিচ্ছি!' ব'লে মুঠোটাকে আরো শক্ত ক'রে দা-খানা গলার ওপর টানবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ প্রচণ্ড শক্তিতে লাফিয়ে উঠলো খাসীটা। সুধন্য আর কেশব খাসীটাকে ধ'রে রাখতে পারলো না। দা-খানা ছিটকে এসে পড়লো তারাপদর নিজেরই বাঁ হাতের আঙুলের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ফিন্‌কি দিয়ে উঠলো রক্ত। তারাপদর হাত থেকে খ'সে পড়লো দা-খানা। খাসীটা মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুতবেগে ছুটতে ছুটতে চ'লে গেলো বাগানের দিকে।

'গেছে গেছে—' ব'লে মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠলো সুবল। সুধন্য আর কেশব ঝুঁকে পড়লো তারাপদর আঙুলের ওপর।

মাটির ওপর ব'সে আঙুলটাকে চোখের সামনে তুলে ধরলো তারাপদ। ঝর্ ঝর্ ক'রে রক্ত ঝরছে। জায়গাটা মুঠো ক'রে ধরলো তারাপদ। দারুণ কেটেছে। ঠিক কি করা উচিত ভেবে উঠতে পারছে না তারাপদ।

'উঠে পড়ো তারাপদ, হাসপাতালে যেতে হবে। এখুনি—' সুধন্য বললো ভয়ার্ত গলায়।

কেশব বললো, 'সেলাই-টেলাইও লাগতে পারে।'

তারাপদ কিছু বললো না। দেখতেই থাকলো রক্ত। সমস্ত শরীর ভয়ঙ্কর একটা উত্তেজনায় থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে।

সুবল তাড়া দিলো, 'নে, উঠে পড় তারাপদ।'

উঠলো না তারাপদ। ঝর্‌ঝর্ ক'রে রক্ত পড়ছে। দা-খানা কোথায়? ওই তো, ঘাসের ওপর প'ড়ে আছে।

দায়ের ওপর চোখ পড়লো তারাপদর। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো আশ্চর্যভাবে। দেখলো, রূপোর মতো ঝক্‌ঝকে দায়ের ওপর রৌদ্রে ঝিকিয়ে উঠেছে কিছু রক্ত।

তারাপদ ঝুঁকে পড়লো রক্তের ওপর। সূর্যের মতো তীব্র দেখাচ্ছে রক্তটুকুকে। ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ।

সমস্ত শরীরে আশ্চর্য একটা শক্তি যেন নদীর ঢেউয়ের মতো জেগে উঠছে। সেই ঢেউয়ে নিজেই ভেসে যাচ্ছে তারাপদ। পৃথিবী জুড়ে বুঝি ছড়িয়ে পড়ছে।

তারাপদর শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো।

সূর্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো তারাপদ। চোখ ধাঁধিয়ে গেলো। রক্তের মধ্যেও তো অমনি চোখ ধাঁধানো উত্তাপ। বড়ো বড়ো নিঃশ্বাসে উঠতে নামতে থাকলো তারাপদর বুক।

তারাপদ আর কাকে ভয় করবে? না, কাউকে ভয় করবে না

তারাপদ।

আর কি চাইতে পারে তারাপদ। না, তারাপদর আর চাইবারও কিছু নেই।

মালতীর মুখ ভেসে এলো মনের মধ্যে। ভেসে এলো মালতীর ধান শুকোবার উঠোনের ছবি। তারাপদর রক্তের উত্তাপে সব যেন পালটে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

'কি হলো রে, চল—' তেমনি ভয়ার্ত গলা সুধন্যর।

'না, আমি কোথাও যাবো না!' ব'লে উঠে দাঁড়ালো তারাপদ।

'সেকি, এতোখানি কেটেছে—' সুধন্য অবাক হ'য়ে বলতে চেষ্টা করলো এবার।

কি উত্তর দেবে তারাপদ? আঙুলটার দিকে তাকালো। রক্তের ধারায় ফের বুঝি ধাঁধিয়ে গেলো চোখ। উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বুঝি বন্ধ হ'য়ে আসছে!

সেই ধাঁধানো চোখ পৃথিবীর গাছপালা ঘাস মাটির দিকে ফিরিয়ে তারাপদ হঠাৎ নিঃশব্দে লম্বা পায়ে হেঁটে ফিরতে থাকলো।

সুধন্যরা পেছন থেকে বিপন্ন গলায় ডাকছে বুঝি।

কিন্তু তারাপদ আর দাঁড়াতে পারবে না কিছুতেই। তারাপদকে এখন ফিরতেই হবে।

এ ফেরা সত্যিকারের এক নতুন শিবিরের দিকে ফেরা।

তারাপদ এবার ছুটতে থাকলো।

কিছু সময় দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে পরিচিত ঘরখানাকে অনুভব করতে চেষ্টা করলো অবিনাশ। উত্তেজনায় ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে যাচ্ছে। বুকের ভেতরে একটা অনিবার্য ভয়ের সম্ভাবনা দোল খাচ্ছে ক্রমাগতঃ।

বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিয়ে পায়ে পায়ে দরজা পেরিয়ে অবিনাশ ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। পুরু লেন্সের মধ্য দিয়ে সুরঞ্জনবাবুর দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝতে চেষ্টা করলো গভীরভাবে।

সুরঞ্জনবাবু সম্ভবতঃ অবাক হ'য়ে গেছেন তাকে দেখে। অবিনাশের মনে হলো। অসহায় অবিনাশ কুণ্ঠিতভাবে আরো খানিকটা এগিয়ে এসে একখানা চেয়ারের গায়ে হাত রেখে একটা অবলম্বন পেতে চেষ্টা করলো।

সুরঞ্জনবাবুকে এখন অস্পষ্ট ছায়ার মতো দেখতে পাচ্ছে অবিনাশ। আরো স্পষ্ট ক'রে দেখতে গিয়ে অবিনাশের ভ্রূ কুঁচকে উঠলো। ঝুঁকে পড়লো অবিনাশ। কি এক অস্বস্তি খেলা করতে থাকলো রক্তের ভেতর।

'কি ব্যাপার, আপনি হঠাৎ!' হঠাৎ-ই যেন সুরঞ্জনবাবুর বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো অবিনাশ।

অবিনাশ কোনো উত্তর দিতে পারলো না সঙ্গে সঙ্গে। কী উত্তর দেবে অবিনাশ? কেউই তো বুঝতে পারছে না, কেন এখানে না এসে তার উপায় নেই। বোধহয় বুঝতে চাইছেও না।

'কি হলো, দাঁড়িয়ে রইলেন যে, বসুন—'সুরঞ্জনবাবুর গলায় সহানুভূতির সুর। সে সুরটুকু ছুঁয়ে গেলো অবিনাশকে। অবিনাশ গভীর আবেগে নুয়ে পড়লো যেন। যে কথা বলতে এসেছে অবিনাশ সে কথা তার বুকের মধ্যে কান্নার মতো নিঃশব্দ যন্ত্রণায় অস্থির হ'তে থাকলো। অবিনাশ এই মুহূর্তে তাকে প্রকাশ করতে পারলো না।

'হেঁটে এসেছেন বুঝি?' সুরঞ্জনবাবু শুধালেন এবার।

পকেট থেকে দ্রুত রুমাল বের ক'রে কপালের ঘামটুকু মুছে ফেললো অবিনাশ।

তারপর ভাঙাগলায় বলল, 'হুঁ।'

'রতন জানে আপনি আসবেন আজকে?' ফের শুধালেন সুরঞ্জনবাবু।

অসহায়ভাবে সুরঞ্জনবাবুর মুখের ওপর চোখ রাখলো অবিনাশ। কী বলবে সুরঞ্জনবাবুকে? রতন তাকে প্রত্যেকদিন আপিস যাবার আগে কোথাও বেরুতে না ক'রে যায়। খানিকটা আদেশের সুর যেন স্পষ্ট হয় রতনের সে কথার মধ্যে।

সুরঞ্জনবাবু বুঝি একটুখানি হাসলেন। হাতের কলমটাকে নাড়াচাড়া করলেন একটু সময়। অবিনাশ বুঝলো, রতনকে না জানিয়েই যে সে চলে এসেছে এখানে, সুরঞ্জনবাবু তার অসহায় মুখের দিকে তাকিয়েই তা বুঝে গেছেন।

সুরঞ্জনবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে অসম্ভব সহজ গলায় বললেন, 'এতো কষ্ট ক'রে যখন এসেছেন তখন নিশ্চয়ই কিছু দরকার আছে আপনার। কী, ঠিক বলেছি কিনা!'

এক মুহূর্তে অনেক কিছু ভেবে ফেললো অবিনাশ। বুকের মধ্যে তোলপাড় হলো রক্তের প্রাচীন প্রবাহ। চোখ ঝাপ্সা হ'য়ে গেলো। ঠোঁটদু'টো থর্ থর্ ক'রে কাঁপলো কিছু সময়।

সুরঞ্জনবাবু ফের বললেন, 'কি হলো, বলুন।'

'আমায় কপি দিন ম্যানেজারবাবু। আমি আজ থেকে আবার কম্পোজে বসবো।' কোনোরকমে অবিনাশ ব'লে ফেললো।

ব'লেই কী জানি কেন দারুণ ক্লান্তি অনুভব করলো অবিনাশ। চোখের ভেতর অসম্ভব যন্ত্রণা শুরু হলো। বোধহয় এখুনি জল গড়িয়ে পড়বে চোখ থেকে।

'কিন্তু আপনি কম্পোজ করবেন কি ক'রে?' সুরঞ্জনবাবু অবাক হ'য়ে বললেন। থামলেন কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর বিপন্নভাবে

'আপনার চোখের যা অবস্থা—'বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

অবিনাশ এক মুহূর্তের জন্য সুরঞ্জনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রবল আবেগে ঝুঁকে পড়লো খানিকটা। তারপর অধৈর্যভাবে বললো, 'না না, আমার চোখ অনেকটা ঠিক হ'য়ে গেছে। আমি এখন অনেকটা আগের মতোই পড়তে-টড়তে পারি। এই তো এতোটা পথ হেঁটে এলাম।···· দিন না আপনার হাতের কাগজখানা, প'ড়ে যাচ্ছি।' ব'লে কাগজখানা নেবার জন্য হাত বাড়ালো অবিনাশ।

হাতের কাগজখানা সরিয়ে সুরঞ্জনবাবু বললেন, 'না না, অবিনাশবাবু, আপনাকে পড়তে হবে না।' ব'লে ফের একটু থামলেন। কি যেন ভাবলেন। শেষে ক্লান্ত গলায় বললেন, 'আপনি তো এ প্রেসের জন্ম থেকেই ছিলেন। বলতে গেলে, এক সময় তো প্রেসটা আপনার ওপরই নির্ভর করতো। আপনি কাজ করতে পারলে আমরা সবাই তো খুশী হতাম। কিন্তু এই অবস্থা নিয়ে কাজ করলে তো আপনারই ক্ষতি হবে।'

'ক্ষতি? কি ক্ষতি হবে? অন্ধ হ'য়ে যাবো এই তো? আমি আর কিছুতেই ভয় পাইনা—কিছুতেই ভয় পাইনা—' উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো অবিনাশ।

সত্যিই আর কিছুতেই ভয় নেই অবিনাশের। কিসের জন্য ভয় করবে অবিনাশ। এই ক'দিনে কাজশূন্য নিস্তরঙ্গ দিনগুলোর মধ্যে অবিনাশ মৃত্যুর ছায়া দেখেছে। ছায়া-শরীর সেই মৃত্যু ক্রমশঃ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে চশমার পুরু কাঁচের ওপর। লক্ষবার চশমার কাঁচ মুছেও সেই ছায়া অবিনাশ মুছতে পারেনি। অবিনাশ জানে, সে ছায়া মোছাও যায় না।

অনেকটা সময় নিঃশব্দে থেকে অবিনাশের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সহজ হ'তে চেষ্টা করলেন সুরঞ্জনবাবু। তারপর বললেন, 'আপনি বরং রোজ আসবেন। গল্প করবেন। ওরা

কাজ-টাজ করছে, দেখে যাবেন। ভালোই লাগবে আপনার।'

'না না, তা চাই না আমি।' তেমনি উত্তেজিতভাবে বললো অবিনাশ।

'ব্যাপারটা আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না কিনা—' কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন সুরঞ্জনবাবু।

অবিনাশ সঙ্গে সঙ্গে বললো, 'বলুন না।'

'রতন আপনার জন্য খুব ভাবে অবিনাশবাবু। আপনি কাজ করতে এসেছেন শুনলে, খুব কষ্ট পাবে রতন।' অসম্ভব গম্ভীর গলায় বললেন সুরঞ্জনবাবু।

রতন যে কষ্ট পাবে, তা অবিনাশ জানে। রতনের একটা সতর্ক চোখ সব সময় তার দিকে স্থির হ'য়ে আছে। পুরানো কথা মনে পড়লো অবিনাশের।

খুব দ্রুত তখন চোখের অবস্থা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছিলো। অবিনাশের সে কথা ভাববার অবকাশ ছিলো না। রতন তা জানতো। আর জানতো ব'লেই হঠাৎ একদিন এসে প্রেসের গণ্ডী থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তাকে।

অবিনাশ যখন বুঝতে পেরেছিলো তাকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে রতন, তখন আর সরাসরি প্রেসে ফিরে আসবার কোনো উপায় ছিলো না।

আজ সকালে রতন বলেছে, তাকে নিয়ে ক'দিন কাশী বেড়িয়ে আসবে। দেশও দেখা হবে, তীর্থও করা হবে।

কিন্তু অবিনাশ সেই মুহূর্তে রতনকে বলতে পারেনি, 'দেশ নয়, তীর্থ নয়, তুই আমায় আবার টাইপ দেখতে দে।' অথচ বলবার জন্য কী দারুণ চেষ্টায় ভেতরে ভেতরে অস্থির হচ্ছিলো অবিনাশ। আর সেই মুহূর্তে অবিনাশ ঠিক ক'রে ফেলেছিলো, সে আজ প্রেসে আসবেই। কম্পোজে বসবেই আজকে। আর তাই রতন বেরিয়ে যাবার পর রতনের স্ত্রীর চোখ এড়িয়ে অবিনাশ এখানে চ'লে

এসেছে।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই অবিনাশ অধৈর্য গলায় ব'লে উঠলো, 'কী হলো, আমায় কপি দিন আমি কম্পোজ করতে বসবো।'

সুরঞ্জনবাবু অসহায় গলায় বললেন, 'আমার একটা কথা রাখুন অবিনাশবাবু। আপনি আরো কয়েকটা দিন বিশ্রাম নিন। তারপর না হয় কাজে আসবেন।'

'না না, অনেক বিশ্রাম নেয়া হয়েছে আমার। আর বিশ্রাম নিলে পাগল হ'য়ে যাবো আমি।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো অবিনাশ।

'কিন্তু কপি ঠিক মতো পড়তে পারবেন না যে। মিছিমিছি কষ্ট করবেন কেন?' ক্লান্ত শোনালো সুরঞ্জনবাবুর কণ্ঠস্বর।

অবিনাশ ভিখিরীর মতো হাত বাড়ালো সুরঞ্জনবাবুর দিকে। বললো, 'দিয়েই দেখুন না একবার।'

অবিনাশ সুরঞ্জনবাবুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু অনুভব করলো, সুরঞ্জনবাবু গভীরভাবে কি যেন ভাবছেন। বোধহয় কপি দেবার কথাটাই। সে জন্যই অবিনাশ নিঃশব্দে তেমনিভাবে হাত বাড়িয়েই রইলো।

আশ্চর্য, অবিনাশ ভাবলো, আজকে কাজ ভিক্ষে চাইতে হচ্ছে তাকে। অন্তহীন বেদনায় অবিনাশের মাথাটা নুয়ে পড়তে চাইলো। তবু কেঁপে ওঠা ঠোঁটদুটো দৃঢ়ভাবে চেপে রেখে স্থির হ'য়ে রইলো অবিনাশ।

সুরঞ্জনবাবু ফের বললেন, 'দিতে আপত্তি থাকবে কেন? শুধু বলছিলাম—'

'আপনার কিছু ভাবনার নেই ম্যানেজারবাবু। আমি আর মাইনেও চাইবো না—'

এবার ড্র'র খুললেন সুরঞ্জনবাবু। ড্র'র খোলার শব্দ পেলো অবিনাশ। কিছু কাগজ বের ক'রে সুরঞ্জনবাবু এগিয়ে দিয়ে বললেন,

'এই যে নিন—তিন নম্বর কেসটা খালি আছে। ওখানেই বসতে পারবেন।'

প্রবল উত্তেজনায় হাত বাড়িয়ে কাগজগুলো নিলো অবিনাশ। চোখের সামনে তুলে ধরলো। কিন্তু কোনো অক্ষর চোখে ভাসলো না। অস্পষ্ট কালো কালো অজস্র রেখা যেন কাগজ ভ'রে টেনে রেখেছে কেউ। চোখের সঙ্গে একখানা কাগজ প্রায় চেপে ধরলো অবিনাশ। রেখাগুলোকে অজস্র অস্পষ্ট অক্ষর মনে হলো এবার। কিন্তু অবিনাশ তার একটা অক্ষরও ধরতে পারছে না। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে অবিনাশের সমস্ত বুকটা অস্থিরভাবে ওঠানামা করতে থাকলো। অবসন্নভাবে অবিনাশ নুয়ে পড়লো অনেকখানি।

'কী হলো, পড়তে পারছেন?' সুরঞ্জনবাবু শুধালেন।

কম্পোজ করতে বসলে অবিনাশ নিশ্চয়ই পড়তে পারবে। অবিনাশ শক্ত হ'য়ে বসলো।

কাগজটা চোখ থেকে নামিয়ে দৃঢ় গলায় বলতে চেষ্টা করলো, 'পারছি।'

কিন্তু অবিনাশের নিজের কানেই যেন কান্নার মতো শোনালো কথাটা।

অবিনাশ আর এক মুহূর্তও বসলো না। উঠে দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে অভ্যস্ত পা ফেলে সুরঞ্জনবাবুর ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের ঘরে ঢুকলো।

পরিচিত যারা, তারা বোধহয় অবাক হ'য়ে গেছে। কিছু বলছেও অবিনাশকে। অবিনাশ সেসব কথা শুনলো না। এখন পৃথিবীর কোনো শব্দই শোনা সম্ভব নয় অবিনাশের। টাইপের কেসটাকে ছুঁয়ে রোমাঞ্চিত শরীরে কয়েক মুহূর্ত কেবল নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলো অবিনাশ।

তারপর ছোটো টুলটাতে ব'সে কম্পোজিং স্টিক হাতে নিয়ে ফের কপিটাকে চোখের সামনে তুলে ধরলো।

না, একটা অক্ষরও স্পষ্ট নয় চোখের সামনে। ঘামে অবিনাশের সমস্ত শরীর ভিজে উঠলো। কম্পোজিং স্টিক কাঁপতে থাকলো হাতে। লেন্সের সঙ্গে কাগজখানাকে লাগিয়ে পড়তে চেষ্টা করলো অবিনাশ। কিন্তু তাও পারলো না। ঠোঁটদু'টো কাঁপতে থাকলো। জ্বালা ক'রে উঠলো চোখ। ঘন ঘন নিশ্বাস নিতে থাকলো। ঠোঁট-দু'টো চেপে ধ'রে চোখ বন্ধ করলো অবিনাশ।

কতোক্ষণ এমনিভাবে অবিনাশ ব'সে রইলো, অবিনাশ তা জানে না। হঠাৎ কেসের ওপর মুখ নামিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। প্রবল চেষ্টা ক'রেও সে কান্না থামাতে পারলো না। হাত থেকে খসে পড়লো কপি, কম্পোজিং স্টিক।

অবিনাশকে যেন অনন্তকাল কাঁদতে হবে এখানে।

হঠাৎ অবিনাশের মনে হলো, কেউ তার কাঁধে হাত রেখেছে।

'কে!' অকারণেই বুঝি আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলো অবিনাশ।

'আপনার ছেলে এসেছে।' সুরঞ্জনবাবু মৃদুস্বরে বললেন।

'রতন এসেছে? কে ওকে আসতে বলেছে?' হঠাৎ রূঢ় হ'য়ে উঠলো অবিনাশ। অসহায় ক্রোধে মুঠো হ'য়ে উঠলো হাত দু'টো। শক্ত হ'য়ে উঠলো সমস্ত শরীর।

'আমিই ওকে খবর দিয়েছিলাম আসবার জন্যে।' সুরঞ্জনবাবু বললেন।

'আপনি কেন ওকে খবর দিয়েছেন ম্যানেজারবাবু? আমি এখন কম্পোজ করতে শুরু করবো। রতন, তুই চলে যা। চলে যা।' যেন ভিক্ষে চাইলো অবিনাশ।

একটু সময় বোধহয় কেউ কথা বললো না। সমস্ত পৃথিবীই যেন নিঃশব্দ হ'য়ে গেলো কিছু সময়ের জন্যে। হঠাৎ সেই নৈঃশব্দের ভেতর থেকে রতনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো অবিনাশ। অসম্ভব গম্ভীর গলায় রতন বললো, 'তুমি চোখে দেখতে পাও না বাবা। মিছিমিছি

প্রেসের অসুবিধে করছো। কষ্ট দিচ্ছো ম্যানেজারবাবুকে। প্রেসের সব্বাইকে কষ্ট দিচ্ছ।'

অবিনাশ অধৈর্যভাবে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমার জন্য কষ্ট করতে ওদের কে বলেছে?'

'তা বলবার দরকার হয় না বাবা।' অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় বললো রতন।

'তাহ'লে আর আমায় বিরক্ত করতে এসো না। ম্যানেজারবাবু, আপনি রতনকে যেতে বলুন।' দু'হাত জোড় করলো অবিনাশ।

একটু থেমে রইলো রতন। তারপর বললো, 'ওরা সবাই তোমাকে ভালোবাসে বাবা। তোমার জন্য ওরা কষ্ট পাবেই। একবার বুঝতে চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবে।'

রতনের কথাগুলো হঠাৎ-ই বুকের কোন্ জায়গাটা যেন ছুঁয়ে গেলো। আর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর মতো আরেকবার ফুঁপিয়ে উঠলো অবিনাশ। কপিটা কেসের ওপর রেখে অবিনাশ মুখ তুলে রতনকে দেখতে চেষ্টা করলো। চোখের জলে এখন চোখ ভ'রে আছে। রতনকে তাই দেখতে পেলো না অবিনাশ।

রতন ফের বললো, 'বাবা, ওরা সবাই চায় তুমি আবার ফিরে আসো এখানে।'

উঠে দাঁড়ালো অবিনাশ। নিঃশব্দে, অভ্যস্থ পায়ে দরজার দিকে হাঁটতে থাকলো।

কেউ কোনো কথা বলছে না। মেসিনের শব্দও নেই। চারিদিকে অসীম নৈঃশব্দ। পায়ের শব্দও মিলিয়ে যাচ্ছে মুহূর্তে।

অবিনাশ অনুভব করতে পারছে, রতন ছুঁয়ে আছে তাকে। কী উত্তাপ রতনের হাতে! সেই উত্তাপে উত্তপ্ত অবিনাশের চোখে পৃথিবীর আশ্চর্য এক সংবাদের উজ্জ্বল কিছু অক্ষর স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। স্নেহ-ভালোবাসায়, উত্তাপে রমনীয় সেই সংবাদ অনন্ত কালের স্রোতে জেগে থাকা কোটি কোটি নক্ষত্রের আলো দিয়ে লেখা।

কেউ জানে না, এই মুহূর্তে ফের কেসে বসলে আশ্চর্য সেই সংবাদ কম্পোজ করতে পারতো অবিনাশ। প্রুফ রীডারকে তার একটি অক্ষরও সংশোধন করতে হতো না। ছাপতে গেলেই সোনা হ'য়ে যেতো মেসিন।

ভাবতে ভাবতে রতনকে ছুঁয়ে অবিনাশ তার নতুন চোখে অপরূপ এক পৃথিবী দেখতে থাকলো। আর দেখতে দেখতেই অবলীলায় প্রেসের চৌকাঠ পেরিয়ে এসে রতনের দিকে ফিরে বললো, 'রতন আমায় এবার বাড়ি পৌঁছে দে তুই।'

বাস স্টপের শেডে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হ'য়ে উঠলো সাধুচরণ। আর একঘণ্টা পরে যদি এই হঠাৎ বৃষ্টিটা নামতো তাহ'লে তারা দিব্যি শেয়ালদাতে পোঁছে ছ'টা দশের ট্রেনটা ধরতে পারতো। সেই ট্রেনেই তো ফিরে যাবার কথা ছিলো তাদের।

বাস স্টপের শেডে ভীড়টা যেন উপচে উঠছে। চতুর্দিকে থৈ থৈ করছে জল। কেউ ভাবেইনি বোধহয়, এমনি হঠাৎ নেমে পড়বে বৃষ্টিটা। অধৈর্য হ য়ে ওঠা ভীড়ের দিকে তাকিয়ে সাধুচরণের সে কথাই মনে হলো।

আজ, এতোকাল পরে, কলকাতায় এসে এমনি অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে সত্যিই অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছে সাধুচরণ। বাসস্টপের এতো ভীড়ও অসহ্য লাগছে সাধুচরণের। ক্রমাগতঃ ঠেলাঠেলিতে পেছনের দিকে চ'লে আসতে হয়েছে। নিমাই তার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। সেও কিছু সুবিধে করতে পারছে না। বরং জলের ছাঁটে বোধহয় কিছুটা ভিজে যাচ্ছে সে।

না, বাস আসছে না অনেকক্ষন। আর যে বাস আসছে, সে বাসও ভীড়ে টইটুম্বুর হ'য়ে আসছে। অনেকগুলোই স্টপে থামছে না। যে দু' একটা বাস থামছে, সেগুলোও যাত্রী উঠবার আগেই ছুটতে ছুটতে চলে যাচ্ছে আবার। বাসে অনভ্যস্ত সাধুচরণ অথবা নিমাই কিছুতেই সেগুলোয় উঠতে পারবে না। সাধুচরণ তা বুঝে ফেলেছে ব'লেই আর উঠবার চেষ্টা করেনি।

'কি করি, বলো তো?' নিমাই সাধুচরণের দিকে তাকালো হঠাৎ।

সাধুচরণ চিন্তিত গলায় বললো, 'আমিও তাই ভাবছি সেই থেকে।'

'কিন্তু কিছু করবার নেই।' একথাটা মনে মনেই বললো সাধু-চরণ।

সত্যিই, আপাততঃ তাদের সুবিধেমতো একটা বাসের জন্য এই ভীড়ে উপ্‌চে ওঠা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। যা বৃষ্টি হচ্ছে, তাতে শেয়ালদা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়া যাবে না। ভিজে তাহ'লে অসুখ করবে দু'জনেরই। মনে মনে হঠাৎ যেন অধৈর্য হয়ে উঠলো সাধুচরণ।

সেই ভোরের ট্রেনে এসেছে দু'জন। সারাদিন ঘুরেছে এখানে সেখানে। তারই ফাঁকে একসময় ধর্মতলায় কিছু ফল কিনেছিলো নিমাই। সেগুলোই খেয়েছে দু'জন। সেজন্যে খিদেয় খুব একটা কষ্ট পায়নি কেউ-ই।

আশ্রমের জমিটুকুর পাকাপাকি বন্দোবস্ত করবার জন্য জেলার হোমড়া-চোমড়া কয়েকজনের চিঠি নিয়ে এসেছিলো সাধুচরণ। মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রে কথাবার্তা সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলেছে। দু'চার-দিনের মধ্যেই চিঠি যাবে। মন্ত্রী নিজেই সেকথা ব'লে দিয়েছেন। এমনি একটা ভালো খবর নিয়ে আশ্রমে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারলে অনেক বেশী আনন্দ হ'তো বুঝি। তাছাড়া এখন একটুখানি বিশ্রামও নিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আশ্রমে সবাই জানে, সন্ধ্যে হ'তে হ'তেই ফিরবে নিমাই আর সাধুচরণ। দু'জনের দেরী দেখে নিশ্চয়ই অকারণে তারা দুশ্চিন্তা করবে। দীর্ঘদিনপর কলকাতায় এসে সাধুচরণ অথবা নিমাইয়ের পক্ষে একটা অঘটন ঘটানো এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। আসবার সময় তারা বারবার সাবধান ক'রেও দিয়েছে সেজন্য।

না, নিজের জন্যে নয়, ওদের জন্যেই যেন সাধুচরণ ব্যস্ত হ'লো হঠাৎ।

নিমাইয়ের দিকে কোনোরকমে ফিরে বললো, 'সবাই আমাদের জন্য ভাববে ওখানে।'

'তা তো ভাববেই।' নিমাই বললো সঙ্গে সঙ্গে।

সাধুচরণ আর কিছু বললো না। নিমাই যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে,

তাতে ওর পক্ষে আর কথা বলাই বুঝি সম্ভব নয়। কষ্টই হচ্ছে সাধুচরণের।

সারাদিন সাধুচরণ আর নিমাইকে এখানে ওখানে ছুটতে হয়েছে। ছুটতে ছুটতেই সাধুচরণ অনুভব করেছে, কতো পাল্টে গেছে শহরটা। লোক বেড়েছে, গাড়ীঘোড়া বেড়েছে, অফিস বেড়েছে—সেই সঙ্গে বেড়েছে মানুষের ছুটোছুটি। কেউ যেন নিজের কথা ছাড়া ভাবতেই পারছে না এখানে। জীবন দিয়ে ভগবান যে সুখ দিয়েছেন, একথা কেউ যেন জানতেই পারছে না আর। জানবার তেমন সুযোগও নেই।

এখানে এসে সাধুচরণের যেমন ক্লান্ত মনে হয়েছে নিজেকে, সুখীও মনে হয়েছে তেমনি। আশ্রমে সে ঈশ্বরের সঙ্গ পায়। শুধুমাত্র নিজেকে নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই সেখানে। পৃথিবী একটা বন্ধন বটে, ঈশ্বর তাতে মুক্তি। সব ইচ্ছেকে একটা ইচ্ছে ক'রে ফেলতে পারলেই পাওয়া যায় তাকে। সব ইচ্ছেকে একটা ক'রে ফেলা যে কি সুখের সাধুচরণ ছাড়া আর কেউ বুঝি তা জানে না। অবশ্য সংসারী লোকেরা তা জানবে কি ক'রে। কাম-ক্রোধ-লোভ-মদ-মোহ-মাৎসর্য তাদের সর্বক্ষণ বন্দী ক'রে রাখে। রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে তাদের চলাফেরা। সাধুচরণের কষ্ট হয় তাদের জন্য। এই যে সেসব থেকে দূরে আছে সাধুচরণ—কোনো কষ্টই হয় না তার। রক্তমাংসের শরীরকে তো সাধুচরণ বিসর্জন দিয়েছে কবেই। কাম-ক্রোধ-লোভেরও সেই সঙ্গে বিসর্জন হয়েছে। সাধুচরণ এখন বলতে গেলে পুরোপুরিই আশ্রমবাসী সন্ন্যাসী।

আপন মনে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসব কথা ভাবছিলো সাধুচরণ। একটা বাস এসে থামলো এমন সময়। বৃষ্টিটাও যেন বেড়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

'এসো, একবার চেষ্টা ক'রে দেখি।'

ব'লেই নিমাই কোনো রকমে সাধুচরণের একটা হাত ধ'রে

বাসের গেটের দিকে ছুটে এলো। বাসস্টপের অনেক যাত্রীই গেটের কাছে পৌঁছে গেছে ততক্ষণে। সবারই সবাইকে পেছনে ফেলে আগে ওঠবার চেষ্টা। সাধুচরণ অসম্ভব বিপন্ন বোধ করলো। মনে মনে ভাবলো, 'ছেড়ে দিই বাসটা। এভাবে ওঠা যায় না কখ্খনো!'

কিন্তু নিমাই কি ক'রে যেন হ্যাণ্ডেলটা ধ'রে ফেলবার ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছে। বিপন্ন সাধুচরণ নিমাইয়ের পেছন পেছন হ্যাণ্ডেলটা ধ'রে কি ক'রে যেন পা রাখলো পাদানীতে। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের ভীড়ের চাপে অবলীলায় ভেতরে চ'লে এলো। প্রবল একটা ভীড় এবং দম বন্ধ করা একটা গরমে মুহূর্তের জন্য নিজেকেও বুঝি ভুলে গেলো সাধুচরণ।

বেল বাজলো বাসের। হৈ হৈ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠলো যেন কারা। জলের একটানা শব্দ তুলে একদিকে কাত হ'য়ে মন্থরগতিতে বাস চলতে শুরু করলো। ভেতরের ভীড়টা নড়েচড়ে সহজ হ'য়ে নিচ্ছে যেন।

সাধুচরণ নিমাইকে খুঁজলো এবার।

আর তখনই সাধুচরণ দেখলো, তাকে আর তারই পাশে দাঁড়ানো নিমাইকে আশ্রয় ক'রে দু'তিনটি মহিলা যেন আত্মরক্ষা করছে ভীড়ের চাপ থেকে। ওঠবার সময় কেবল নিজেকেই দেখছিলো ব'লে সাধুচরণ এদের দেখতে পায়নি। এখন যেন মনে হচ্ছে বাস-স্টপের শেডে এরা অপেক্ষা করছিলো বাসের জন্য। আগের দু'দুটো বাসে এরা উঠতে গিয়েও উঠতে পারেনি।

সন্ন্যাসীর পোশাক দেখে বোধহয় আশ্রয় নেবার ভরসা পেয়েছে। মনে মনে হাসলো সাধুচরণ। এই ভীড়ে সন্ন্যাসীই আত্মরক্ষা করতে পারছে না!

অঝোরে বৃষ্টি বুঝি ঝরেই চলেছে। দরজার ঝুলন্ত যাত্রীরা ঢুকে পড়তে চাইছে বাসের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ভীড়ের চাপ বেড়ে উঠছে ভেতরে।

নিমাই আর সাধুচরণের মধ্যের ফাঁকটুকু কমে গেলো। আর সাধুচরণ অসহায়ভাবে অনুভব করলো, মহিলারা তাদের শরীরের সঙ্গে একাকার হ'য়ে মিশে গেছে।

ভয়ে উত্তেজনায় নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে সাধুচরণের। মহিলা থেকে একশো হাত দূরে থাকে সে। তাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলে প্রাণান্তকর চেষ্টায়। অথচ এখানে সর্বাঙ্গ দিয়ে সে স্পর্শ ক'রে আছে মহিলাদের। কী উত্তাপ! সাধুচরণের রক্ত বুঝি ফুটতে শুরু করেছে সেই উত্তাপে!

সাধুচরণ নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে নিজের চারদিকে তাকালো। না, কেউ দেখছে না তাকে। কেউ চেঁচিয়ে উঠছে না, 'তোমার সাধুত্ব চ'লে গেলো হে—'

প্রবল শব্দ করছে বাসটা। গেটের কাছে চ্যাঁচামেচি হচ্ছে। কন্‌ডাকটারের ব্যাগের পয়সার শব্দ হচ্ছে ঘন ঘন।

সেই সমস্ত শব্দের মধ্যে কোন্ শৈশবে সন্ন্যাসী হ'য়ে যাওয়া সাধুচরণের শরীর কি ক'রে ক্রমশঃ রক্ত-মাংসের শরীর হয়ে গেলো সাধুচরণ তা টের পেলো না। মেয়েদের শরীরে কি আছে? সাধু-চরণ মুহূর্তের জন্য চোখ বুজলো একবার।

সাধুচরণ নিজের শরীরকেও চিনতে থাকলো ক্রমশঃ। তারপর দু'হাতে মাথার ওপরের রডটাকে শক্ত ক'রে ধ'রে সাধুচরণ অবশ হ'য়ে ঝুলে রইলো কেবল।

কন্‌ডাকটার 'শেয়ালদা, শেয়ালদা' ব'লে চ্যাঁচাতে সাধুচরণের খেয়াল হলো তাকে শেয়ালদাতে নামতে হবে। মাথার ওপরের রডটাকে ছেড়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে চেঁচিয়ে বললো, 'নিমাই, নেমে এসো, শেয়ালদাতে পৌঁছে গেছি।'

বাস থামলো। অজস্র লোক নামবে এখানে। গেটের দিকটা পাতলা হয়ে যাচ্ছে।

সাধুচরণ আর কোনোদিকে তাকাচ্ছে না। কেন জানি ভরসা

হচ্ছে না তাকাতে। গায়ের গেরুয়া ঘামে ভিজে গেছে। অন্য এক স্রোতের মধ্যে যেন ডুবে উঠেছে সাধুচরণ। সেই স্রোতেই ভিজেছে তার গেরুয়া। সমস্ত সৃষ্টিই ভেসে চলেছে সেই স্রোতে। সাধুচরণ অনুভব করলো।

নিমাই ঠিক পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'ছ'টা দশের ট্রেনটা পাবোই, কি বলো?' মৃদুস্বরে বললো নিমাই।

'তা পাবো।' ক্লান্ত গলায় বললো সাধুচরণ। কেন জানি চোখ বুজে দাঁড়িয়েই থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে সাধুচরণের। কিন্তু তার আর উপায় কোথায়!

'একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে তবু।' নিমাই বললো ব্যস্ত গলায়।

বলতে বলতেই পায়ে পায়ে গেটের কাছে এগিয়ে এলো। তারপর সুযোগ পেতেই নেমে পড়লো নীচে। সাধুচরণও নামলো।

আশ্চর্য, বৃষ্টিটা প্রায় ক'মে গেছে। ফাটল ধরেছে মেঘে। একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো সাধুচরণ।

পথ কিন্তু নোংরাজলে আর প্যাচ প্যাচে কাদায় পা ফেলবার অযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। পায়ের চটি তাতে ডুবিয়েই দ্রুতপায়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে থাকলো সাধুচরণ আর নিমাই। ছ'টা দশের ট্রেনটা পেতেই হবে। নাহ'লে আটটার আগে কোনও ট্রেন নেই। সে ট্রেনে গেলে আশ্রমে পৌঁছুতে পৌঁছুতে রাত বারোটা। তাদের জন্য দুশ্চিন্তায় কষ্ট পাবে সবাই।

তা ছাড়া, সাধুচরণ এখন আর দাঁড়াতে পারছে না। ভেঙে পড়ছে সারা শরীর। সমস্ত শরীর জুড়ে রাশি রাশি রক্ত মাংস এসে জড়ো হচ্ছে! সমস্ত শক্তি দিয়েও সাধুচরণ তা ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না। দ্রুতপায়ে কোনো রকমে স্টেশনের দিকে হাঁটতেই থাকলো সাধুচরণ।

ছ'টা দশের ট্রেনটাই পেলো সাধুচরণ আর নিমাই। বসবার

জায়গাও পেলো। কিন্তু আশ্চর্যভাবে চুপ ক'রে ব'সে রইলো নিমাই। সাধুচরণও স্পষ্টভাবে তাকাতে পারলো না নিমাইয়ের দিকে।

ট্রেন চলতেই ট্রেনের মৃদু আলোয় সাধুচরণ তাকালো নিজের দিকে। ঘামে ভেজা গেরুয়ার আড়ালে এবার রক্তমাংসের একটা পরিপূর্ণ একটা শরীরকে অনুভব ক'রে শিউরে উঠলো সাধুচরণ। অসহায়ভাবে বড় ক'রে নিঃশ্বাস নিলো বার কয়েক। জোর ক'রেই মনে মনে আশ্রমের কথা ভাবতে থাকলো।

ভাবতে ভাবতেই স্টেশনের পর স্টেশন ফেলে এলো পেছনে।

আকাশ ততক্ষণে পরিষ্কার হ'য়ে গেছে অনেকটা। জানালা দিয়ে চোখ বাড়িয়ে ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে চাঁদের শরীর মাঝে মাঝেই পরিপূর্ণ দেখতে পাচ্ছে সাধুচরণ।

শেষ পর্যন্ত কি ভেবে সাধুচরণ চোখ বুজে ট্রেনের শব্দ শুনতে থাকলো।

ঠিক সময়মতোই সাধুচরণদের নিয়ে পৌঁছুলো ট্রেন।

নিঃশব্দেই দু'জন নামলো ট্রেন থেকে। নিমাইয়ের কাছে টিকিট দু'টো। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গেটে টিকিট দু'টো দিয়ে বেরিয়ে পড়লো নিমাই। পেছন পেছন সাধুচরণ বেরিয়ে এলো।

'একটু জোরে পা চালাবে—'বেরিয়েই কথাটা ব'লে জোরে পা চালিয়ে নিমাইয়ের আগে আগে হাঁটতে থাকলো সাধুচরণ।

এখন জ্যোৎস্নায় বৃষ্টিতে মাখামাখি হ'য়ে আছে পৃথিবী। সাধুচরণ আকাশের দিকে তাকালো। অনুজ্জ্বল দু'একটা তারা ছেঁড়া মেঘের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে।

কি কথা মনে হচ্ছে সাধুচরণের? গলাটা যেন আটকে আসছে গভীর একটা আবেগে। সাধুচরণের যেন কান্না পাচ্ছে। রক্তমাংসের শরীর কখনও বোধহীন হ'তে পারে? তাহ'লে তো সন্ন্যাসীও হ'তে পারে না। সে-ও তো একটা বোধ। কেউ সে শরীর নিয়ে সন্ন্যাসী হয়, কেউ সংসারী হয়।

নিমাই হঠাৎ খুব কাছে এসে মৃদুস্বরে বললো, 'কি ভাবছো গো সেই তখন থেকে ?'

সাধুচরণ নিমাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, জ্যোৎস্নায় থৈ-থৈ করছে তার মুখ। গাছপালা, ঘাস, মাঠের মতোই জ্যোৎস্না মেখে আছে সে।

সাধুচরণের সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। মৃদুস্বরে বললো, 'জানো, যতই ভগবান-ভগবান করি, শরীরটা কিন্তু রক্তমাংসেরই থেকে যায়। তার মধ্যেই আবদ্ধ থাকে মন। সেই মন কখনও হয় সন্ন্যাসী, সংসারী হয় কখনও।'

অবাক হ'য়ে সাধুচরণের মুখের দিকে তাকালো নিমাই।

সাধুচরণ হাসলো। তারপর বললো, 'একখানা আরশি মুখের সামনে ধোরো, ঠিক বুঝতে পারবে ব্যাপারটা।'

ব'লেই সাধুচরণ মুখ ফেরালো নিমাইয়ের দিক থেকে।

তারপর জ্যোৎস্নায় গেরুয়ার আড়ালে থাকা শরীরটাকে মেলে দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে থাকলো নিমাইয়ের আগে আগে।

## পৃথিবীর পুরানো গল্প

বিশাল কৃষ্ণচূড়ার নির্জন ছায়ার নীচে এসে দাঁড়ালেন সমরেশ-বাবু। ছায়ার ভেতর ধুলো উড়িয়ে খেলতে থাকা কয়েকটা চড়ুই উড়ে গেলো ডানায় মৃদু শব্দ ক'রে।

সেদিকে একবার তাকিয়ে রুমালে মুখ মুছলেন সমরেশবাবু।

একটা ট্যাক্সিও স্ট্যাণ্ডে নেই। মনে মনে সমরেশবাবু বিরক্ত হলেন খানিকটা।

অবশ্য দুপুরবেলায় ট্যাক্সি কমই থাকে এখানে। অপেক্ষা করতে হ'বে একটু সময়। ট্যাক্সি আসবে, যাত্রী তুলবে ছ'জন। তারপর যাবে।

একটা সিগারেট ধরালেন সমরেশবাবু।

আজকে খুব গরম পড়েছে। রৌদ্রের রঙ এখন খাঁটি রূপোর মতো। আসতে বেশ কষ্ট হয়েছে। কৃষ্ণচূড়ার এই ছায়া অবশ্য সেই কষ্টটুকু মুছে দিয়েছে।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে সিগারেট টানতে থাকলেন সমরেশবাবু।

অনেকক্ষণ পর একরাশ ধুলো উড়িয়ে একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো।

এগিয়ে এলেন সমরেশবাবু।

'ট্যাক্সি যাবে তো ?' ট্যাক্সিঅলাকে শুধালেন মৃদুগলায়।

'যাবে। উঠে পড়ুন। ছ'জন হ'লেই স্টার্ট দেবো।' ব'লে ট্যাক্সির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ট্যাক্সিঅলা।

ধুলায় ধূসর জীর্ণ ট্যাক্সিটার দিকে একবার তাকালেন সমরেশ-বাবু। তিরিশ মাইল রাস্তা এর ভেতরে ব'সেই যেতে হবে।

এর আগেও এখান থেকে ট্যাক্সিতে গেছেন সমরেশবাবু। কিন্তু

আজ, এই রৌদ্রতপ্ত দুপুরে তিরিশ মাইল পথকে সুদূর মনে হচ্ছে অনেক বেশী।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা শেষ করলেন সমরেশ-বাবু। মনে মনে আর পাঁচজন যাত্রীর জন্য প্রার্থনা করলেন। তার-পর জীর্ণ ট্যাক্সিটার দরজার হাতল ঘুরিয়ে পেছনের এক কোণায় গভীর আলস্যে বসলেন সমরেশবাবু। ট্যাক্সিটা একটা বড়ো বাড়ির ছায়ায় ব'লে ভেতরে একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। সাদাটে এবং কিছুটা ঘষা কাঁচ দরজায় এবং পেছনে মাথার কাছে। সেজন্যে ভেতরে আলোর ঔজ্জ্বল্যও নেই। নিঃশব্দে একদিকের কাচ নামানো জানালার মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন সমরেশবাবু। আরো পাঁচজন যাত্রীর জন্য তাকে আরো অনেকটা সময় হয়তো এমনি ব'সেই থাকতে হবে।

বাইরে রূপালী আলো গাছে পাতায় পথে খেলে বেড়াচ্ছে। চারদিক উত্তাপে খানিকটা ঝিমিয়ে পড়েছে যেন। পথের দু'পাশের ছোটো ছোটো দোকানগুলো নির্জন হ'য়ে আছে। খানিকটা বিশ্রাম হচ্ছে এই কথা মনে ক'রে সমরেশবাবু ক্লান্ত হলেন না।

ট্যাক্সিঅলা একটা সিগারেট ধরিয়েছে। হঠাৎ তাকে খানিকটা ব্যস্ত মনে হচ্ছে। অন্ততঃ একজন যাত্রী যে তার ট্যাক্সির মধ্যে আর পাঁচজনের জন্য অপেক্ষা করছে, সে কথা সম্ভবতঃ অনুভব করতে পারছে সে। সে জন্যে সে খানিকটা ব্যস্তও বোধহয়।

'এই যে এদিকে আসুন।' বলতে বলতে ট্যাক্সিঅলা সিগারেট হাতে নিয়ে হঠাৎ দ্রুত এগিয়ে গেলো। সমরেশবাবু তেমনি নির্জন পেছনের সীটের কোণার দিকে ব'সেই রইলেন। উৎসাহ প্রকাশ ক'রে উঠে দেখলেন না একবারও। এই ট্যাক্সির জন্য হয়তো আরেকজন যাত্রী। ছ'জন হ'তে বেশ খানিকটা সময় লাগবে।

কথাটা ভেবেই সামনের কাচের মধ্য দিয়ে পথের দিকে তাকালেন সমরেশবাবু।

ঘুম পাচ্ছে বুঝি। বাড়িতে থাকলে অবশ্য ঘুমোতেন।

ছোট্ট ক'রে একবার হাই তুললেন সমরেশবাবু।

ওপাশে ট্যাক্‌সিঅলা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। শব্দ ক'রে ক'রে চ'লে যাচ্ছে একটা খালি রিক্সা।

কতক্ষণে যে আর পাঁচজন যাত্রী আসবে কে জানে? কথাটা ভেবে একটুখানি বুঝি ক্লান্ত হ'লেন সমরেশবাবু।

ঠিক তখুনি হঠাৎ সমরেশবাবু দেখলেন, ট্যাক্‌সিঅলা সামনের দরজা খুলে দু'জনকে বসিয়ে দিলো সামনের সীটে। যারা বসলো, তাদের দু'টি প্রজাপতির মতো লঘু আর স্বচ্ছন্দ মনে হলো সমরেশ-বাবুর। তারা হঠাৎ যেন অনুকূল হাওয়ায় এখানে ভেসে চ'লে এসেছে। তারা কেবল পরস্পরকে অনুভব করছে। একটা চাপা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে তারা। সমরেশবাবু যে পেছনে ব'সে আছেন দু'জনে কিন্তু তা দেখলো না। অথবা সমরেশবাবুর মনে হলো, এখন তারা অনুভবের পৃথিবীটাকে ছাড়া আর কিছুই দেখতে চায় না।

সমরেশবাবু ট্যাক্‌সির ভেতরে ঠিক তেমনিভাবে ব'সেই তাদের দু'জনকে দেখতে থাকলেন।

খুব ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসেছে দু'জনে।

মেয়েটি এক সময় মৃদু গলায় বললো, 'এই ভালো হলো কিন্তু।'

সমরেশবাবু বুঝতে পারলেন, মেয়েটির নির্জনতা ভালো লাগছে।

ছেলেটি বললো, 'বাসের ভীড় আমারও ভালো লাগে না। বিশেষ ক'রে তুমি সঙ্গে থাকলে।'

শেষের কথাটা ব'লে ছেলেটি হাসলো। সমরেশবাবু ছেলেটির মুখ পাশ থেকে দেখতে পাচ্ছিলেন। মেয়েটির মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তার কাঁধের ওপর গড়িয়ে নামা ঢিলে খোঁপাটির আন্দোলন দেখেই তাকে বুঝতে পারছিলেন।

'আজকে রোদ্দুরটা খুব তেতে উঠেছে।' মেয়েটি বললো।

'কিন্তু এই ট্যাক্সির মধ্যে আমার খুব আরাম লাগছে। রিকস্য় আস্বার সময় যেমন গরম লাগছিলো, বাব্বা।' ছেলেটি মেয়েটির দিকে তাকিয়েই আছে।

মেয়েটি হঠাৎ মাথা নামিয়ে বললো, 'মা বলছিলেন তোমাকে যেন আরো ছ'টো দিন থাকবার জন্য রাজী করাই। বিয়ের পর এই প্রথম এলে তো!'

সমরেশবাবুর মনে হলো ছেলেটি মেয়েটির হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিলো। তারপর খানিকটা হাল্কা গলায় বললো, 'ছেলেদের আপিস আর স্ত্রী এ ছ'টো একসঙ্গে ম্যানেজ ক'রে চলতে হয় যে। থাকবার ইচ্ছে হচ্ছিলো আমারও। এমন খাতির যত্ন রাজা-বাদশারও ঈর্ষার বিষয়।'

মেয়েটি মুখ তুলে লঘুস্বরে হাসলো। বললো, 'তোমার মুখে স্ত্রী কথাটা শুনলে আমার অদ্ভুত লাগে।'

ছেলেটিও হেসে উঠলো এবার।

সমরেশবাবু অদ্ভুত একটা অনুভূতির মধ্যে ডুবে যেতে থাকলেন এবার। নিজের শারীরিক অস্তিত্বটুকুকে যেন হঠাৎ ভুলে গেলেন তিনি। ট্যাক্সির এই শীতলতার মধ্যে, নরম আলোর মধ্যে নিজেকে তার অশরীরী একটা কিছু মনে হলো।

ওদের ছ'জনকে আরো স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে সমরেশবাবুর।

মেয়েটি ডানহাত দিয়ে খোঁপাটা একবার স্পর্শ ক'রে বললো, 'সুমিত্রা' আমায় কি বলেছে জানো?

ছেলেটি বললো, 'কি ক'রে জানবো?'

'বলেছে, তোর স্বামীকে দেখলে আমার হিংসে হয়। তখন স্বামী শব্দটা এতো ভারী ভারী আর হাসির মনে হচ্ছিলো যে হেসেই ফেলেছিলাম আমি। বলেছি, স্বামীটামী নয়, বল রঞ্জনকে দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।'

রঞ্জন এবার হেসে ফেললো, বললো, 'স্বামী বললে নিশ্চয়ই

তোমার একটা লোক ব'লে মনে হয় রাণু। স্ত্রী বললেও আমার কিন্তু তোমার মতো ছোটখাটো এবং কলেজে পড়া কোনো মেয়েকে মনে হয় না। বেশ লাল টক্‌টকে চওড়া পাড়ওয়ালা সাদা শাড়িপরা, আধুলীর মতো বিরাট একটা সিঁদুরের ফোঁটা কপাল জুড়ে আঁকা—'

রাণু খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। রঞ্জন আর বাকিটা বলতে পারলো না।

হাসি থামতেই রঞ্জন বললো, 'সুমিত্রার কথা কি বলছিলে! ও তোমায় হিংসে করে আমার জন্যে। বেশ মজা তো!'

'সুমিত্রার বোধহয় শিগ্‌গীরই বিয়ে।'

'তুমি বিয়েতে আসবার কথা দিয়ে গেছো নাকি ?'

'না দিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আগেই বলে রাখি, তোমায় তখন আমায় পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে।' রাণু রঞ্জনের মুখের দিকে তাকালো।

রঞ্জন হাসছে। রঞ্জনকে খুব সমৃদ্ধ মনে হচ্ছে এখন। একজন রাজার চাইতেও রঞ্জন অনেক বেশী সমৃদ্ধ। সমরেশবাবু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রঞ্জনের দিকে।

রাণু ফের তার খোঁপাটায় হাত রেখে বললো, 'কিছু বললে না যে!'

'কী আর বলবো আমি। তুমি তো আগেই ব'লে রাখলে যে পৌঁছে দিতে হবে তোমায়।' হাসতে হাসতেই রঞ্জন বললো।

ট্যাক্‌সিঅলা শেষ হ'য়ে যাওয়া সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুত চলে গেলো। সমরেশবাবু একটু সময়ের জন্য চোখ ফিরিয়ে দেখলেন। রাস্তাটা ফের নির্জন দেখাচ্ছে। একটা রিক্‌স কেবল উধাও হ'য়ে যাচ্ছে দূরে।

রাণু ডানহাতখানা বাড়িয়ে স্টীয়ারিং হুইলটা ধরলো। ফর্সা এবং সুডৌল হাতে একরাশ অলংকার। ব্লাউজের হাতাটা কনুই পর্যন্ত

দীর্ঘ। লাল টকটকে ব্লাউজটাতে রাণুকে আরো বেশী ভালো লাগছে। রঞ্জনের দিকে মন রেখেই ষ্টীয়ারিংটাকে আস্তে আস্তে নাড়াতে থাকলো রাণু। রাণুকে খুব ছোটো আর নিষ্পাপ মনে হচ্ছে সমরেশবাবুর।

রঞ্জন পকেট থেকে দামী একটা সিগারেট বের ক'রে ধরালো। জানালা দিয়ে ধুঁয়োটা ছুঁড়ে দিয়ে বললো, 'অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি।'

'তোমার সিগারেটের গন্ধটুকু খুব ভালো লাগে আমার।' রাণু বললো।

রঞ্জন হেসে বললো, 'ছোটবেলায় এই গন্ধের লোভেই সিগারেট খাওয়া ধরেছিলাম।'

রাণু সামান্য শব্দ ক'রে হাসলো। তারপর বললো, 'তাই ব'লে মনে কোরো না আমিও সিগারেট খাওয়া অভ্যেস করবো।'

রঞ্জন বললো, 'অভ্যেস করলেই বা! দু'জন একসঙ্গে ব'সে টেনে টেনে প্যাকেট ফুরিয়ে ফেলবো।'

লঘু স্বরে ফের হেসে উঠলো দু'জন।

সমরেশবাবু সিগারেটের গন্ধ পাচ্ছেন। ট্যাকসির ভেতরটাই গন্ধে ভ'রে উঠেছে। খুব ভালো লাগছে সমরেশবাবুর। রঞ্জনকে অসম্ভব শৌখিন আর সুখী মনে হচ্ছে এখন।

হাসি থামিয়ে সামনের কাচের দিকে মুখ ফিরিয়ে রঞ্জন সিগারেট টানছে। রাণুও সেদিকে তাকিয়েছিলো। হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে বললো, 'পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে আমাদের।'

'ঠিক এক ঘণ্টা।'

'মাত্র!' কেমন বিষণ্ণ গলায় বললো রাণু।

'এক ঘণ্টা তোমার কাছে 'মাত্র হ'লো?' রঞ্জন খানিকটা চমকে উঠলো যেন।

'একটা জীবনও আমার কাছে 'মাত্র' মনে হচ্ছে এখন।

ট্যাক্‌সিটা যদি অনন্তকাল চলতো তাহ'লে সুখ পেতাম।' ফের বললো রাণু।

রঞ্জন অবাক হ'য়ে তাকালো রাণুর দিকে। তারপর একটু ঝুঁকে নিবিড় গলায় রঞ্জন যেন স্বগতোক্তি করলোঃ 'আমারও তাই মনে হচ্ছে রাণু।'

রাণু আর কিছু বললো না।

রঞ্জন চোখ ফেরালো সামনের দিকে। আশ্চর্য একটা নির্জনতা ছবির মতো ধরা হ'য়ে গেলো দু'জনের মাঝখানে।

মনে মনে দু'জনেই বুঝি ভেসে চলেছে সুদূরে!

রঞ্জনের কথার মধ্যে কোথায় যেন একটা সত্যি আছে। রাণু আর রঞ্জনের জন্য একটা জীবন অত্যন্ত ছোটো। এই ট্যাক্‌সির মতো এক ঘণ্টা ছুটেই বুঝি জীবনটা হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে।

সমরেশবাবুর বুকের মধ্যে ব্যথা জমে উঠলো। রঞ্জন এবং রাণুর বুকের মধ্যেও নিশ্চয়ই ঠিক এইরকম ব্যথা জমেছে।

সমরেশবাবু স্থির চোখে তাকিয়েই রইলেন দু'জনের দিকে। অনুভবের গভীরে কেউ যেন পৃথিবীর অনিবার্য কোনো খেলার খবর জানিয়ে চলে যাচ্ছে। তাকে ধরা যাচ্ছে না, ছোঁয়া যাচ্ছে না।

খানিকটা বুঝি অসহায় হ'য়ে গেলেন সমরেশবাবু।

রঞ্জন আর রাণু আরো অনেকখানি ঘনিষ্ঠ হ'য়ে বসেছে। রঞ্জনের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট। রাণুর হাতখানা স্থির হ'য়ে আছে ষ্টীয়ারিং-এর ওপর। লাল পাথরের একটা আংটি দীপ্ত হ'য়ে আছে অনামিকায়।

ট্যাক্‌সিঅলা আরো যাত্রী আনতে গেছে। সম্ভবতঃ এখুনি ফিরবে।

সমরেশবাবু এবার সামনের সীটে রঞ্জন আর রাণুকে নয়, সমরেশ আর আরতিকে দেখলেন। ক্রমে সেখানে পৃথিবীর সমস্ত

দম্পতিকে দেখলেন। যাদের প্রত্যেকের কাছে একটা জীবনও ছোটো ছিলো, অথচ তারা সবাই জানতো মাত্র এক ঘণ্টা ট্যাক্‌সি চলবে। তারপরই নেমে পড়তে হবে ট্যাক্‌সি থেকে।

চোখ বন্ধ করলেন সমরেশবাবু।

দীর্ঘ একটা মিছিল চলেছে। সেই মিছিলের কণ্ঠে জেগে উঠছে চিরকালের পুরানো পৃথিবীর গল্প। রাণু আর রঞ্জন সেই মিছিলের দিকে হেঁটে চলেছে তাদের অজান্তেই।

রোমাঞ্চিত সমরেশবাবু বড়ো ক'রে একটা নিঃশ্বাস নিলেন।

## তীর্থযাত্রা

আপিসের চেয়ারে ব'সে জানালায় চোখ রেখেই বিকেলের ছবি দেখলেন মণিমোহন। বাইরেও ছোট্ট মাঠের ওপর সুপুরির দীর্ঘছায়া, ঘাসের ঘন সবুজে নির্জন বিষণ্ণতা, উড়ে যাওয়া পাখির দীর্ঘস্বরে ডেকে যাওয়া, সব ছুঁয়ে গেলো মণিমোহনকে। মণিমোহনের মনে হয়, এখানে না এলে এই ছবি দেখা হতো না তার। আর এই ছবি দেখা না হ'লে অনেক কিছুই যেন অদেখা রয়ে যেতো।

এসব কথা ভাবতে ভাবতেই মণিমোহন ড্র'রে চাবি দিলেন। কলমটা বন্ধ ক'রে পকেটে নিয়ে সিগারেট ধরালেন একটা। তারপর নিজের ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে উঠে পড়লেন।

তু'একজন এখনও টেবিলে ঘাড় ডুবিয়ে কাজ ক'রে যাচ্ছে। তারা মণিমোহনের পায়ের শব্দে একবার শুধু চোখ তুললো কয়েক মুহূর্তের জন্য। মণিমোহন সেই চোখে কৌতূহলহীন অবসন্নতা দেখলেন। খানিকটা অন্যমনস্ক হলেন মণিমোহন।

বাইরে এসে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলেন। আপিসবাড়িটা ছোট্ট শহরটির এক কোণায় ব'লে মণিমোহন আসা-যাওয়ার পথে বেশ খানিকটা আনন্দ কুড়িয়ে পান। সেজন্য মণিমোহন নিজেকে ভাগ্যবান ব'লেও ভাবেন কখনও কখনও।

হাঁটতে হাঁটতে মাঠের কাছে পৌঁছুলেন মণিমোহন। মাঠটা ঘুরে রাস্তা চ'লে গেছে।

অবশ্য কোনাকুনি মাঠটাকে পেরিয়ে গেলে অনেক তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছুনো যায়। মণিমোহন মাঠের মধ্যে নেমে পড়লেন।

এখানে এসে প্রথম দিনই তিনি মাঠ পেরিয়ে আপিসে গেছেন, বিকেলে ফিরেওছেন মাঠ পেরিয়ে। তারপর থেকে এই মাঠের মধ্য দিয়ে তার যাওয়া আসা।

দীর্ঘ সবুজ এই মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে অসম্ভব ভালোও লাগে মণিমোহনের। সকালবেলা যখন মাঠের ভেতর দিয়ে হেঁটে যান, তখন উজ্জ্বল রৌদ্রে সমস্ত মাঠ জুড়ে সবুজ রং টলমল ক'রে ওঠে। কিছু কিছু শিশির তখন সেই সবুজের মধ্যে মুক্তোর মতো জ্বলে। হঠাৎ সেই সবুজ রং মণিমোহনের পায়ে লেগে গেলে মণি-মোহন নিশ্চয়ই চম্‌কে উঠবেন না।

বিকেলবেলা মাঠের পাশে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানো দীর্ঘ গাছগুলোর দীর্ঘতম ছায়ায় সেই সবুজ ঘাস আশ্চর্য রকম স্নিগ্ধ দেখায়। আপিস থেকে ফেরার সময় কখনও কখনও দূরের পাখির ডাক শোনেন। তারপর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েন ক্রমশঃ। সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে তখন স্নিগ্ধ অনুভবে শান্ত সমুদ্রের মতো বিস্তৃত হ'য়ে যান মণিমোহন।

দু'আঙুলে ধ'রে থাকা সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে দিলেন মণিমোহন।

মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটতে থাকলেন আস্তে আস্তে। অনেকটা এসে হঠাৎ দেখতে পেলেন, মাঠের শেষ প্রান্তে বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে কেউ অসম্ভব নিঃশব্দে ব'সে আছে। দূর থেকে চিনতে পারলেন না মণিমোহন। শুধু গাঢ় নীল আকাশের নীচে ছায়াচ্ছন্ন মাঠের কাছে সেই বিশাল কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে সেই মানুষটিকে তাঁর সমস্ত সুখদুঃখের বাইরে ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসী ব'লে মনে হলো। হঠাৎ রোমাঞ্চিতও হলেন মণিমোহন। দ্রুতপায়ে হেঁটে কৃষ্ণচূড়া গাছের কাছাকাছি এলেন। এসেই অবাক হলেন। অশ্বিনীবাবু অমনিভাবে ব'সে আছেন গাছের তলায়।

'আরো কিছুটা এগিয়ে আসতেই অশ্বিনীবাবু দেখতে পেলেন মণিমোহনকে। তাঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। মাথা ঝুঁকিয়ে তিনি মণিমোহনকে কাছে ডাকলেন।

কাছে না ডাকলে হয়তো মণিমোহন অশ্বিনীবাবুর কাছে যেতেন না। কয়েকটা মুহূর্ত কেবল দাঁড়িয়ে থেকে চ'লে আসতেন। অশ্বিনীবাবু ডাকলেন ব'লেই, তার মনে হলো, 'এখানে ব'সে তাঁর

সঙ্গে খানিকটা সময় গল্প ক'রে গেলে অসম্ভব ভালো লাগবে। নিশ্চয়ই কিছুক্ষণের জন্য আনন্দিত স্বর্গের অনুভব কুড়িয়ে পাবেন তিনি। মনে হলো, তার বুকের মধ্যেই ছিলো এমনি একটা প্রার্থনা।

বাড়িতে প্রতিমা হয়তো তার দেরি দেখে অধৈর্যভাবে অপেক্ষা করবে। সেজন্য তার এমন কিছু ভাববার নেই।

পায়ে পায়ে অশ্বিনীবাবুর সামনে এসে দাঁড়ালেন মণিমোহন। তেমনি ধ্যানমগ্ন দেখাচ্ছে অশ্বিনীবাবুকে।

'বাড়িতে ফেরার তাড়া আছে নাকি?' মৃদুস্বরে শুধালেন অশ্বিনী-বাবু।

'না।'

'তাহ'লে বসুন এখানে।'

অশ্বিনীবাবু তার পাশেই যেন ঘাসের একখানি দুর্লভ আসন বিছিয়ে দিলেন মণিমোহনের জন্য। মণিমোহন অসম্ভব সুখে তার ওপর ব'সে পড়লেন। অশ্বিনীবাবুর বয়স হয়েছে। অবশ্য ঠিক কত বয়স তা ধরা যায় না। সত্তর হ'তে পারে, পঁচাত্তরও হ'তে পারে। দীর্ঘ, সুন্দর এবং সুখী অশ্বিনীবাবু। এখানে ছেলের কাছেই থাকেন। খুশী-মতো বেড়িয়ে বেড়ান। সবার সঙ্গেই তার পরিচয় ঘনিষ্ঠ। এখানে আসবার দিন কয়েক পরেই হঠাৎ একদিন অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে মণিমোহনের। বলতে গেলে যেচেই আলাপ করেছেন অশ্বিনী-বাবু। ক্রমে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছেন তাঁরা দু'জন। বয়সের পার্থক্যটুকু আপনি মুছে গেছে একসময়।

'আপিস থেকেই তো ফিরছেন?' অশ্বিনীবাবু শুধালেন।

'হ্যাঁ।'

'দেরি হ'লে বাড়িতে নিশ্চয়ই ভাববে।'

'তাতে কিচ্ছু এসে যাবে না।' ব'লে একটু থামলেন মণিমোহন। তারপর ফের বললেন, 'আপনি এখানে কতক্ষণ এসেছেন?'

'অনেকক্ষণ। শরীরটা ভালো নেই। ভাবলাম একটু নির্জনে ব'সে

থাকলে ভালো লাগবে। তাই চ'লে এসেছি।'

'আপনাকে তাহ'লে আর বিরক্ত করবো না।'

লজ্জিতভাবে মণিমোহন প্রায় উঠতে যাচ্ছিলেন। অশ্বিনীবাবু জোর ক'রে বসালেন তাঁকে।

বললেন, 'সেকি, বিরক্ত হ'লে আপনাকে ডাকবো কেন? আপনি বসুন।'

মণিমোহন সহজভাবে বসলেন আবার। বললেন, 'জায়গাটা ভারি চমৎকার। আমারও মাঝে মাঝে আপিস থেকে ফিরে যাবার সময় এখানে কিছুক্ষণ ব'সে যেতে ইচ্ছে হয়।'

একটু থেমে মণিমোহন বললেন, 'অথচ একদিনও তা হয় না।'

স্মিত হাসলেন অশ্বিনীবাবু।

মাঠের ওপরের আকাশ দিয়ে বিকেলের পাখি উড়ে যাচ্ছে। দূরের আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমে। কৃষ্ণচূড়া গাছে অজস্র পাখির ডাকাডাকি। নির্জন মাঠ আরো নির্জন হ'য়ে উঠছে ক্রমশঃ। দু'জনেই সেই নির্জনতায় একাকার হ'য়ে যাচ্ছেন ব'লে মনে হলো মণিমোহনের।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকবার পর অশ্বিনীবাবু হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'জানেন মণিমোহনবাবু, আমরা একেবারেই নির্বোধ। না হ'লে এমন জায়গা থাকতে এখানে আসতে ইচ্ছে হয় না!'

'আসবার মতো মন চাই যে!' অসম্ভব মৃদুগলায় বললেন মণিমোহন।

অশ্বিনীবাবু বললেন, 'স্বার্থটাকে বড়ো ক'রে দেখতে গিয়ে সেই মনটাকে হারিয়ে ফেলেছি। মানুষের সঙ্গে হেসে কথা বলতে খরচ নেই, তবু হেসে কথা বলি না। কারো সুখে সুখী হ'তে খরচ নেই, তবু কেউ সুখী হ'তে পারি না। কাউকে বুকে তুলে নিতে খরচ নেই, তবু তুলে নিই না। ভাবতে গেলে ভারি আশ্চর্য লাগে আমার।'

মণিমোহন নিবিড়ভাবে অশ্বিনীবাবুর বেদনার্ত মুখের দিকে

তাকালেন। দেখলেন সে মুখ ক্রমশঃ পাল্টে যাচ্ছে।

রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠলেন মণিমোহন। মানুষকে কখনও কখনও দেবতার মতো দেখায়। অশ্বিনীবাবুর পাল্টে যেতে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে মণিমোহন এক সময় অবাক হ'য়ে দেখলেন, ধ্যানমগ্ন অশ্বিনীবাবুকে দেবতার মতো দেখাচ্ছে।

হৃদয়ের এই বিপুল বিস্তৃতি যাঁর ভেতরে তাঁকে মানুষের মতো দেখাবে কি ক'রে, মণিমোহন অসম্ভব আনন্দে একটা কথাও বলতে পারলেন না আর। ঘাসের আসনে যেমনিভাবে বসেছিলেন, তেমনিভাবেই ব'সে রইলেন তিনি।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার মাঠ জুড়ে নামলে লক্ষ লক্ষ জোনাকি ভেসে এলো কোথা থেকে। আকাশটাকে সুদূর ক'রে দিলো দু' তিনটি নক্ষত্র।

নিঃশব্দে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে উঠে দাঁড়ালেন অশ্বিনীবাবু। মৃদু স্বরে বললেন, 'চলুন, ফিরবো এবার।'

মণিমোহন বললেন, 'চলুন।'

আর কোনো কথা হ'লো না। দু'জনে মাঠ থেকে পথে উঠে এলেন। তারপর জোনাকির আলোয় আলোকিত পথ দিয়ে হাঁটতে থাকলেন নিঃশব্দে।

হাঁটতে হাঁটতে মণিমোহনের বাড়ির কাছাকাছি আসতেই অশ্বিনীবাবু শান্ত গলায় বললেন, 'আজ যাচ্ছি, কাল আবার দেখা হবে।' ব'লে তেমনি নিঃশব্দে হাঁটতে থাকলেন।

অশ্বিনীবাবুর দীর্ঘ চেহারাটা অন্ধকারে নিঃশেষে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন মণিমোহন।

আশ্চর্য এক উপলব্ধিতে মণিমোহন ভ'রে উঠলেন। তিনি যেন দীর্ঘ সময় অন্য কোথাও কাটিয়ে এসেছেন, যেখানে যেতে অনেক প্রস্তুতি দরকার, যেখানে যাবার পথ সমস্ত জীবন ধ'রে খুঁজে বেড়াতে হয়, অথচ খুঁজে পাওয়া যায় না।

এই মুহূর্তে অশ্বিনীবাবুকে অসম্ভব অচেনা মনে হলো মণি-মোহনের।

পরদিন আপিস থেকে বিকেল ফুরিয়ে ফেরার সময় মাঠের পাশে সেই কৃষ্ণচূড়া গাছতলায় অকারণেই যেন অশ্বিনীবাবুকে খুঁজলেন মণিমোহন। না, আজ আর অশ্বিনীবাবু সেখানে বসেন নি।

গতকালের সন্ধ্যেটাকে মনে পড়লো মণিমোহনের। সঙ্গে সঙ্গে চোখে ভাসলো অন্ধকারে ঢাকা আকাশে দু'একটি তারার আলো। মাঠ জুড়ে লক্ষ লক্ষ জোনাকির ওড়াউড়ি। তার মধ্যে অশ্বিনীবাবুর ধ্যানমগ্ন চেহারাটাও ভেসে উঠলো। কেন জানি এখন মনে হচ্ছে, অশ্বিনীবাবুর চোখ দূরের সেই তারার দিকে স্থির হয়েছিলো তখন। মণিমোহন রোমাঞ্চিত হলেন।

আস্তে আস্তে হেঁটেই সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের পাশ দিয়ে মাঠ পেরিয়ে রাস্তায় উঠে এলেন মণিমোহন। যে কোনো মুহূর্তে অশ্বিনী-বাবু এসে পড়তে পারেন, মনে হলো মণিমোহনের। অশ্বিনীবাবুর জন্য তার অপেক্ষা করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো। ভেতরে ভেতরে কেন জানি অকারণ চঞ্চলতা অনুভব করতে থাকলেন মণিমোহন।

বাড়িতে ফিরতেই প্রতিমা দ্রুত কাছে এসে বললো, 'তুমি এখনও খবরটা জানো না?'

অবাক হ'য়ে মণিমোহন বললেন, 'কিসের খবর?'

'অশ্বিনীবাবু হঠাৎ মারা গেছেন।' প্রতিমার মুখে বেদনার ছায়া মুহূর্তে গাঢ় হ'য়ে উঠলো।

'অশ্বিনীবাবু মারা গেছেন?···কখন?' বিস্ময়ে বেদনায় প্রতিমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন মণিমোহন।

'এই তো খানিক আগে।'

'তুমি কার কাছে জেনেছো?'

'কে যে ব'লে গেলো, ঠিক মনে পড়ছে না।'

মণিমোহন দরজা ধ'রে দাঁড়ালেন। বিকেলের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে চতুর্দিক থেকে। সেই ফুরিয়ে যেতে থাকা আলোয় অশ্বিনীবাবুর মৃত্যুসংবাদ দূরের সেই নক্ষত্র পর্যন্ত যেন বিস্তৃত হ'য়ে যাচ্ছে। মণি-মোহন সব হিসেব ভুলে গেলেন এক মুহূর্তে।

'তোমার সঙ্গে গতকালই বোধহয় শেষ দেখা হয়েছে অশ্বিনী-বাবুর?'

'হুঁ।' ব'লে কয়েক মুহূর্ত থামলেন মণিমোহন। তারপর বললেন, 'আমি একটু ঘুরে আসছি ওখান থেকে।'

প্রতিমা কিছু বলতে যাচ্ছিলো। মণিমোহন তা শুনলেন না। সময় নেই। ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাইরে এলেন। তেমনি-ভাবে ছুটতে ছুটতেই প্রায় এক নিঃশ্বাসে এসে দাঁড়ালেন অশ্বিনীবাবুর বাড়ির সামনে। মণিমোহনের মনে হ'লো, দারুণ বেদনায় সমস্ত বাড়িটাই যেন নিরুচ্চার হ'য়ে আছে।

গেটের কাছে জনাকয়েক নীচু গলায় কথা বলছিলো। তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে এসে বললো, 'আপনি ভেতরে চ'লে যান।'

নিঃশব্দে গেট পেরিয়ে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন মণিমোহন।

উঠোনে কিছু লোক ভীড় ক'রে আছে অশ্বিনীবাবুকে ঘিরে। কেউ শব্দ করছে না। একটা পেট্রোম্যাক্সের আলোয়, তার মৃদু শোঁ শোঁ শব্দে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা ক্রমাগতঃ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে।

মণিমোহন পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ফুল দিয়ে ঢাকা অশ্বিনীবাবুর খাটের পাশে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের নিশ্চল রেখাগুলোর দিকে তাকিয়ে অবসন্নবোধ করলেন ভেতরে ভেতরে।

অশ্বিনীবাবু অসম্ভব আনন্দে সমাধিস্থ হ'য়ে আছেন। মণি-মোহনের মনে হ'লো।

অশ্বিনীবাবুর মুখের নিশ্চল রেখাগুলোর মধ্যে এখন আরো অনেক গভীর উচ্চারণ অনুভব করলেন মণিমোহন। গতকাল সন্ধ্যায়

অশ্বিনীবাবুর বলা কথাগুলো মনে পড়লো তার। স্পষ্টই উপলব্ধি করলেন, সেসব কথা বলবার পর সবাইকেই এমনিভাবে সমাধিস্থ হ'য়ে যেতে হয়।

এবার ভয় নয়, অবসন্নতা নয়, রমনীয় সুখে রোমাঞ্চিত হ'লেন মণিমোহন। নিঃশব্দে একপাশে এসে দাঁড়ালেন।

সন্ধ্যা আর একটু ঘন হ'তে শ্মশানযাত্রীরা এসে দাঁড়ালো খাটের কাছে। ঘরের ভেতর থেকে এবার কান্নার শব্দ ঘর ছাড়িয়ে সন্ধ্যার আকাশ ছুঁয়ে ফেললো। উঠোন ভ'রে ফেললো ছোট ছোট কথা।

খাটখানা কাঁধে তুলবার আগে মণিমোহন আরেকবার অশ্বিনীবাবুর মুখের দিকে তাকালেন। কী আশ্চর্য সমাধি! মণি-মোহন ঝুঁকে পড়লেন। সমস্ত শরীর এবার উত্তেজনায় কাঁপছে। তবু স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু পারলেন না। শ্মশানযাত্রীরা চারজন খাট কাঁধে তুলতেই সামনের একজনকে সরিয়ে দিয়ে নিজের কাঁধ বাড়িয়ে দিলেন মণিমোহন।

তারায় স্নিগ্ধ সন্ধ্যার বিপুল আকাশের তলায় শ্মশানের দিকে এবার যাত্রা শুরু হলো। অনির্বচনীয় সুখের ভেতর ছড়িয়ে পড়তে পড়তে মণিমোহন অনুভব করলেন, দেবতার শরীর বহন ক'রে তিনি চিরকালের তীর্থে তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিতে চলেছেন।

গলির মোড় ঘুরেই ভয়ে বিস্ময়ে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লো সুনীলেশ। এক পাও আর নড়তে পারলো না।

পাড়ার ছেলেগুলো খোকনকে রকের ওপর ফেলে খোকনের সমস্ত শরীরে সুড়্‌সুড়ি দিচ্ছে। অসহায়ভাবে খোকন অদ্ভুত রকমের শব্দ করছে মুখে। খোকনের মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে ঠিক তেমনি ক'রে শব্দ করছে ছেলেগুলো। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। কিছুতেই উঠতে দিচ্ছে না খোকনকে।

হঠাৎ কোনোরকমে উঠে দাঁড়ালো খোকন। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়লো রক থেকে নীচে। প'ড়েই ছুটতে থাকলো বাড়ির দিকে। সবগুলো ছেলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো। গড়িয়ে পড়লো হাসতে হাসতে। তারপর খোকনের মতো ভঙ্গি ক'রে নিজেদের মধ্যে কিছু বলতে থাকলো, হাসতে থাকলো দারুণ একটা কৌতুকে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে যেন ঘটে গেলো ব্যাপারটা।

সুনীলেশের পা নড়ছে না আর। সমস্ত শরীরের ভেতর একটা ঝড়ের বাতাস যেন তরঙ্গিত হ'য়ে গেছে। এই মুহূর্তে কোথাও চ'লে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে সুনীলেশের। কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে চেঁচিয়ে। খুন করতে ইচ্ছে হচ্ছে ছেলেগুলোকে।

কোনোরকমে সুনীলেশ পা বাড়ালো।

খোকনকে নিয়ে ওরা এখনও কৌতুক ক'রে যাচ্ছে।

সুনীলেশ কাছাকাছি আসতেই থামলো ওরা। দম বন্ধ ক'রে বুঝি হাসি সামলালো। মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকালো কেউ কেউ। কেউ আড়চোখে দেখলো সুনীলেশকে। সুনীলেশের ইচ্ছে হলো, ছেলেগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে যা ইচ্ছে তাই ক'রে ফেলে এই মুহূর্তে।

কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সুনীলেশ পা বাড়ালো। তারপর দ্রুত পায়ে খোলা দরজা পেরিয়ে বাড়িতে ঢুকলো।

খোকন ঈজিচেয়ারটাতে ব'সে ছবির বই দেখছে গভীর মনো-যোগে। না, খোকন তাকে ঢুকতে দেখলো না। সুনীলেশ একটু সময় দাঁড়িয়ে নিবিড়ভাবে দেখলো খোকনকে। চোখের কোল বেয়ে জলের রেখা এখনও বুঝি স্পষ্ট হ'য়ে আছে।

হাসতে হাসতে চোখের জল পড়েছে খোকনের।

হাসতে হাসতে না কাঁদতে কাঁদতে?

নিবিড় একটা কান্নায় সুনীলেশের গলার ভেতরটা ব্যথা ক'রে উঠলো। নিজেকে কোনোরকমে সামলে নিলো সুনীলেশ।

খোকন কি কখনও হাসে? হাসতে পারে?

না, খোকন হাসতে পারে না। খোকন কেঁদেই যায়। সুনীলেশ মাথার চুলগুলো মুঠো ক'রে ধরলো। যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার ভেতর। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে।

খোকন বইয়ের পাতা উল্টেই চলেছে। এখন পুরো বইখানাই খোকনের মুখের ওপর। খোকন কি সব ভুলে গেছে এরই ভেতর? কি জানি!

রীতা নিশ্চয়ই রান্নাঘরে বিকেলের খাবার করছে। সুনীলেশের ফেরাটা টের পায় নি রীতা।

ফের খোকনের কথা ভাবলো সুনীলেশ। খোকন পৃথিবীর কোনো শব্দ শুনলো না কোনোদিন। ও বোধহয় জানেই না পৃথিবীতে কোনো শব্দের অস্তিত্ব আছে। শব্দ ব্যাপারটাই ওর কাছে শূন্য।

শব্দ ব্যাপারটাই শূন্য—সুনীলেশ কি তা ভাবতে পারে? কখনোই পারে না।

যখন খোকন খুব ছোটো ছিলো, তখন গান গেয়ে খোকনকে ঘুম পাড়াতো রীতা। রীতার গাওয়া গানের সেই সুর এখনও বুঝি সুনীলেশ শুনতে পায়। রীতার মুখের সেই ছবি এখনও ভেসে যায় চোখের সুমুখ দিয়ে।

বিয়ের আগে গান শিখতো রীতা। ডিপ্লোমাও পেয়েছে। বিয়ের পর খানিকটা অসুবিধে হয়েছিলো সত্যি। নানান ঝামেলাও চলছিলো সুনীলেশের। ঠিক করেছিলো খোকন একটু বড়ো হ'লে আবার যাতে গানের চর্চা করতে পারে রীতা, তার ব্যবস্থা করবে।

মাঝে মাঝেই রীতাকে সে কথা বলতো। খুশী হ'য়ে উঠতো রীতা।

কিন্তু হঠাৎ-ই একদিন রীতা আবিষ্কার করেছিলো, খোকন কোনো শব্দ শুনতে পায় না। খোকনের উচ্চারণ করা শব্দগুলোও অন্যরকম। খোকনের চোখের মধ্যেও একটা শূন্যতা আবিষ্কার ক'রেছিলো রীতা। কান্নায় ভেঙে পড়েছিলো সুনীলেশকে বলতে গিয়ে।

সেদিন রীতার চোখে কি দেখেছিলো সুনীলেশ?

না, সুনীলেশ তা বলতে পারবে না। অতো বড় একটা হাহাকারের ছবি এখন স্বপ্নে দেখলেও ভয়ে সুনীলেশ সারারাত ঘুমোতে পারে না। মনে হয়, সে যেন কোনো অতল শূন্যে ডুবে যাচ্ছে। যেখান থেকে কেউ তাকে টেনে তুলতে পারবে না।

রীতা বলবার পর সুনীলেশও খোকনের মধ্যে কথা না বলবার সবগুলো লক্ষণ অনুভব করেছিলো। তবু মনে হতো, হঠাৎ কোনো একদিন অজস্র কথায় ভ'রে দেবে খোকন। স্বপ্নেও বুঝি তা দেখতো সুনীলেশ! যেদিন সে স্বপ্ন দেখতো সুনীলেশ, সেদিন সকালবেলা থেকে গভীর প্রত্যাশায় তাকিয়ে থাকতো খোকনের দিকে। কী এক অস্থিরতা জেগে উঠতো সমস্ত শরীরে।

কিন্তু একদিন, যেদিন খোকনের দু'বছরের জন্মদিন, সেদিন ছোট পিসিমা সমস্ত আড়াল ভেঙে দিয়ে, সমস্ত প্রত্যাশাকে একফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে ভয়ংকর গলায় ব'লে উঠেছিলেন, 'সুনীল, তোর ছেলে তো বোবা হয়েছে!'

রীতা সেদিন থেকে আর খোকনকে গান গেয়ে ঘুম পাড়ায় না।

সেদিন থেকে রীতা নিজেই যেন বোবা হ'য়ে আছে। সুনীলেশও আর খোকনের কথা বলবার স্বপ্ন দেখে না।

সেদিন থেকে খোকনকে এক মুহূর্ত না দেখলে অস্থির হ'য়ে ওঠে রীতা। পৃথিবীর কোনো শব্দ শুনতে পায় না যে ছেলে তার জন্য পৃথিবীর সব শুনতে পাওয়া মায়ের হৃদয় কি যন্ত্রণায় নিঃসঙ্গ হ'য়ে থাকে, সুনীলেশ তা অনুভব করতে পারে।

সমস্ত কাজের মধ্যে আশ্চর্য একটা ক্লান্তি সুনীলেশকে যেন আচ্ছন্ন ক'রে রাখে সর্বক্ষণ।

সুনীলেশ জানে, এই ক্লান্তি তাকে অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে। এ থেকে তার মুক্তি নেই।

খোকন যতো বড়ো হচ্ছে, ততোই যেন সঙ্গীর জন্য আকাংখা বাড়ছে খোকনের। হঠাৎ-হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে যায় খোকন। রীতা কিছু বলতে গিয়েও কিছু বলে না। নিঃশব্দে দরজায় দাঁড়িয়ে খোকনকে দেখে। খোকনের খুশী মুখ কখনও কখনও রীতাকে সুখ দেয়। অনুভব করতে পারে সুনীলেশ।

এই পাড়ায় আসবার পর অবশ্য কখনও বাইরে যায়নি খোকন। আজ বোধহয় লুকিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলো। রীতাও টের পায় নি। টের পেলে রীতা দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতো নিশ্চয়ই।

অসহায়ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুনীলেশ ফের খোকনের দিকে তাকালো। ভেজা জলের রেখা চোখের কোল জুড়ে। ছবি দেখতে দেখতে কি যেন বুঝতে চেষ্টা করছে খোকন। ভ্রু কুঁচকে আছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো খোকন।

পকেট থেকে সন্দেশের ছোট্ট বাক্সটা বের করলো সুনীলেশ। মৃদুস্বরে ডাকলো, 'খোকন—'

খোকন শুনলো না।

সুনীলেশ দু'পা এগিয়ে এলো। আস্তে ক'রে ছুঁয়ে দিলো খোকনকে। ছবির বই রেখে সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠলো খোকন। হাত

থেকে সন্দেশের প্যাকেটটা নিয়ে খুশীতে হাসতে থাকলো। সেই খুশী-খুশী মুখখানা একবার দেখে নিয়ে ভেতরে এলো সুনীলেশ।

রীতা বিকেলের খাবার করছিলো। সুনীলেশের পায়ের শব্দ শুনেই ফিরে তাকালো।

সুনীলেশের মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝি চম্‌কে উঠলো রীতা।

সুনীলেশ নিজেকে সহজ করতে চেষ্টা করলো। খোকনকে নিয়ে পাড়ার ছেলেদের কৌতুক করবার কথাটা কিছুতেই রীতাকে বলা যাবে না। কষ্ট পাবে রীতা। ভেতরে ভেতরে কান্নায় তলিয়ে যাবে।

রীতা উঠে এলো। চোখে চোখ রেখে বললো, 'তোমাকে এতো শুকনো দেখাচ্ছে কেন? কি হয়েছে?'

'কই, নাতো!' সপ্রতিভ হ'তে চেষ্টা করলো সুনীলেশ।

'আমার কাছে লুকিয়ো না।' অসহায় গলায় বললো রীতা।

না, রীতার কাছে লুকোনো যাবে না। রীতাকে বুঝি খোকনের সমস্ত বেদনার স্পর্শ পেতেই হবে। কাজেই, শেষ পর্যন্ত সবটুকু বলতেই হলো। বলতে বলতে অসহায় উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকলো সুনীলেশ।

ঠিক তখুনি পেছনে খোকনের সাড়া পেলো। কি বুঝেছে খোকন, কে জানে, একরাশ শব্দ ক'রে মাথা ঢুলিয়ে বললো, কখ্‌খনো সে আর যাবে না ওদের ওখানে।

রীতা নিবিড় মমতায় খোকনের মুখের দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় বললো, 'না, কখ্‌খনো আর যেয়ো না। তোমায় মামা বাড়িতে নিয়ে যাবো। ওখানে তোতনদের সঙ্গে খেলবে।'

ঘাড় কাত্‌ ক'রে 'হ্যাঁ' ব'লে ঢক্‌ ঢক্‌ ক'রে এক গ্লাস জল খেলো খোকন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে ছুটতে বাইরে চ'লে গেলো।

সুনীলেশ বললো, 'সেই ভালো। মাঝে মাঝে ওকে তোতনদের সঙ্গে খেলা করিয়ে আনবে।'

তেমনি ধরা গলায় রীতা বললো, 'আজ কেন যে খেয়াল করিনি,

জানি না। যাগ্‌গে, খোকন আর নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে খেলতে যাবে না।'

ম্লানভাবে হাসলো সুনীলেশ। খোকনের চোখের জলের রেখাটা সুনীলেশ কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

রীতা আঁচলে তার টলটলে চোখ-দু'টো মুছে ফেলে হঠাৎ ব্যস্ত ভাবে ডুবে গেলো কাজের ভেতর। সুনীলেশ শোবার ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

অফিসের জামাকাপড় পাল্‌টে বারান্দায় সাজানো ইজিচেয়ারে এসে বসতে গিয়েই অবাক হলো সুনীলেশ। খোকন কোথায় গেলো? ওর তো বাইরে যাবার কথা নয়। তাহ'লে কি রান্না ঘরে?

'রীতা, খোকন তোমার কাছে?' উঁচু গলায় সুনীলেশ শুধালো।

রীতা ভেতর থেকেই বললো, 'না, এখানে নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে প'ড়ে নিখিলেশ ঘরগুলো দেখলো, বাথরুম দেখলো, ছাতের ওপরটাও দেখে এলো সেই সঙ্গে।

না, কোথাও খোকন নেই। তাহ'লে ফের বাইরে গেছে নিশ্চয়ই।

সুনীলেশ দ্রুত পায়ে বাইরে এসেই চম্‌কে উঠলো। আবছা অন্ধকারে পাড়ার একটা ছেলে চিত হ'য়ে প'ড়ে আছে, তার বুকের ওপর চেপে বসেছে খোকন। খোকনের দু'হাতের আঙুল চেপে ব'সে আছে ছেলেটার গলায়। সম্ভবতঃ আপ্রাণ চেষ্টায় দম নেবার চেষ্টা করছে সে। তার মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে হাঁ ক'রে মুখ নাড়াচ্ছে খোকন।

এই ছেলেটাই সব চাইতে বেশী অত্যাচার ক'রেছিলো খোকনের ওপর। খোকন নিশ্চয়ই তা দেখে নিয়েছিলো।

ছেলেটার গলা যেভাবে চেপে ধরেছে খোকন, ছেলেটা নিশ্চয়ই তাতে ম'রে যাবে। সুনীলেশের মধ্যে কি যেন হ'য়ে গেলো মুহূর্তে। চেঁচিয়ে উঠলো, 'খোকন—'

খোকন পৃথিবীর কোনো শব্দ শুনতে পায় না। খোকনের কাছে পৃথিবী শব্দহীন।

সুনীলেশ ছুটে এলো। টেনে তুলতে চেষ্টা করলো খোকনকে। বারো বছরের খোকনের গায়ে অসুরের মতো শক্তি। অব্যক্ত গলায় চেঁচিয়ে সে বাধা দিতে চেষ্টা করলো সুনীলেশকে।

কিন্তু সুনীলেশ শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়ে নিয়ে তু'হাতে ধ'রে থাকলো বিশাল হ'য়ে ওঠা খোকনকে।

ছেলেটা উঠে দাঁড়ালো। ঢোক গিললো বারকয়েক। বড়ো বড়ো ক'রে দম নিলো। তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে ছুটতে থাকলো গলির ভেতর দিয়ে।

সুনীলেশ হাঁপাতে হাঁপাতে তাকালো খোকনের মুখের দিকে। খোকনের মুখে বৃষ্টির মতো ঘাম। হাঁপাচ্ছে খোকন। গলায় অব্যক্ত তুর্বোধ্য কিছু শব্দ। চোখ তু'টো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে যেন।

ছেলেটাকে এখ্‌খুনি খুন ক'রে ফেলতো খোকন। এখ্‌খুনি! কি হতো, যদি সুনীলেশ বেরিয়ে না আসতো।

উত্তেজিতভাবে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা ক'রে খোকন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো। মুহূর্তে অধৈর্যভাবে সুনীলেশ একটা চড় বসিয়ে দিলো খোকনের গালে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলো খোকন। মুহূর্তের জন্য নির্বোধের মতো তাকালো তার মুখের দিকে।

পরমুহূর্তে তার গলা থেকে একটা কান্নার শব্দ আকাশ ছাপিয়ে উঠলো। তু'হাতে খোকন আঁকড়ে ধরলো সুনীলেশকে। সুনীলেশ চোখ বুঁজলো।

খোকনের কাছে সমস্ত পৃথিবী শব্দহীন! অতলান্ত একটা শূন্যতা চোখে ভেসে উঠলো সুনীলেশের।

শব্দহীন পৃথিবীতে খোকন একটা শব্দময় কান্নায় সুনীলেশকে ক্রমশঃ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। সুনীলেশের সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো অন্য এক অনুভবে।

আবছা অন্ধকারে খোকনকে ছুঁয়ে সুনীলেশ নিঃশব্দ কান্নায় এবার খোকনের অভিমানটুকুকে নিজের বুকের মধ্যে তুলে নিলো। তারপর অন্ধকারে জেগে ওঠা সুদূরের একটি নক্ষত্রের দিকে চোখ রেখে নিঃশব্দেই উধাও হ'য়ে গেলো।

ট্রেন চলতে শুরু করতেই একবার বাঙ্কের ওপর রাখা জিনিসপত্র-গুলো দেখে নিলো সুভাষ। তারপর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকা মালতীর মুখের দিকে তাকালো। মনে হলো, মালতী বুঝি বেরিয়ে পড়ার সুখটুকু নিবিড়ভাবে অনুভব করবার চেষ্টা করছে। মালতী বুঝি আর প্রতিদিনের সেই মালতী নয়।

মনে মনে হাসলো সুভাষ। নিজেকে ভারি সুখী মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। একটা সিগারেট ধরাতে গিয়েও ধরালো না। আশ-পাশের যাত্রীদের একবার দেখে নিয়ে ফের মালতীর দিকে ফিরে মৃদুস্বরে ডাকলো মালতীকে।

মালতী ফিরলো সুভাষের দিকে।

'ওখানে যদি ভালো একটা থাকবার জায়গা পেয়ে যাই, তাহলে কিন্তু দিন সাতেক থেকে যাবো।' সুভাষ বললো ঘনিষ্ঠ গলায়।

কথাটা শুনে দু'মুহূর্ত কি যেন ভাবলো মালতী। বললো, 'দেখবে, থাকবার জন্যে তাহলে ঠিক একটা ভালো জায়গা পেয়ে যাবো।'

কিছু বললো না সুভাষ। বুঝতে পারলো মালতা ক্রমশঃ একটা স্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

সুভাবকে কিছু বলতে না দেখে মালতী ফের বললো, 'ওখানে পৌঁছে আবার কথাটা ভুলে যেও না কিন্তু।'

মালতীর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে সুভাষ বাইরে তাকালো। এই মুহূর্তে নিজেকে ভারি হালকা মনে হচ্ছে। এমনিভাবে নিশ্চিন্তে ব'সে কোন দিন বুঝি শুধু মালতীর কথা ভাবেনি সুভাষ। ভাববার সুযোগও হয়নি।

সুভাষের হাতের ওপর এবার আলগোছে একখানা হাত রেখে মালতী বললো, 'কি হলো, কিছু বলছো না যে!'

'কিন্তু একটা সর্ত আছে। সেটা তোমায় মানতে হবে।' সুভাষ বললো সঙ্গে সঙ্গে।

খানিকটা অবাক হয়ে মালতী বললো, 'সর্তটা কি ?'

মনে মনে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সুভাষ বললো, 'সেই সাতদিন আমি ঘুম থেকে ন'টার আগে উঠবো না। কোন কারণেই ন'টার আগে তুমি আমায় ডাকতে পারবে না।'

সর্তটা শুনে হেসে ফেললো মালতী। ঠাট্টা ক'রে বললো, 'সর্তটা আমি মানতে রাজি আছি কিন্তু তুমি ঠিক ন'টা পর্যন্ত ঘুমোতে পারবে তো ?'

'দেখে নিয়ো পারি কিনা।' সুভাষ বললো।

মালতী কিছু বললো না। দু'চোখে তার অবিশ্বাসের হাসি খেলা করলো শুধু।

সত্যিই, মালতী কি ক'রে বিশ্বাস করবে কথাটা ?

সুভাষের নিজেরই মনে নেই, কবে সে সূর্য ওঠার পর ঘুম থেকে উঠেছে। ন'টা পর্যন্ত শু'য়ে কাটাবার কথাটা তো ভাবতেই পারে না সুভাষ। ভাবা সম্ভবও নয়। চারটে বাজতে বাজতেই তৈরী হ'য়ে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হয় তাকে। বিয়ের পর প্রথম প্রথম মালতী উঠতো। ঘুম চোখে দাঁড়াতো দরজায়। রাস্তার নির্জন আলোয় সাইকেল চালাতে চালাতে কখনও কখনও পেছনে তাকিয়ে মালতীর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা নির্জন চেহারাটা দেখেছে সুভাষ। বুঝতে পারতো মালতীর খুব কষ্ট হচ্ছে। বুঝতে পেরেই মনে মনে অসহায় হয়ে যেতো।

এখন কিন্তু সুভাষের ওঠার আগেই উঠে পড়ে মালতী। সুভাষকে ডেকে তুলেও দেয় কোন কোন দিন। চা ক'রে দিতে চায়।

কিন্তু সুভাষ মালতীকে চা করতে দেয় না কিছুতেই।

মালতী একেকদিন ঠাট্টা ক'রে বলে, 'রবিবার ক'রে অন্ততঃ কাগজগুলো বন্ধ থাকা উচিত।'

সুভাষ হেসে বলে, 'জানো, তাহলে মাসে চার চারটে দিনের রোজগার বন্ধ হবে আমাদের।'

মালতী আর কিছু বলে না। সুভাষ বুঝতে পারে, তার অসহায়তাটুকু অনুভব ক'রে কষ্ট পায় মালতী।

কিন্তু মালতীর তো আর কিছু করবার নেই। সংসার তো সুভাষকেই চালাতে হবে।

একটা ছোট কারখানায় চাকরী করে সুভাষ। সেই চাকরী ক'রে সুস্থ ভাবে বাঁচা যায় না বলেই একদিন সে খবরের কাগজের হকারী শুরু করেছিলো। বিয়ের পর আর সেই হকারী ছেড়ে দেবার কোনও প্রশ্নই ছিলো না। বরং সুভাষ এখন আরো কাজ বাড়াতে চেষ্টা করছে।

এই কাজটার জন্যই আর কোথাও বেরোনো হয় না সুভাষের। বলতে গেলে বেরোবার কথাটা ভাববার কোনও সুযোগই ছিলো না।

পরিতোষের উৎসাহেই এই প্রথম বেরোলো সুভাষ। সুভাষের ফিরে আসা পর্যন্ত পরিতোষই কাগজ দেবার কাজটা ক'রে দেবে। আসলে পরিতোষের সঙ্গে সুভাষের সম্পর্কটা ভায়ের মতো। সুবিধে অসুবিধেয় পরিতোষই এসে পাশে দাঁড়ায়। টিকিট কাটা থেকে যাবার ব্যবস্থা, সবই ক'রে দিয়েছে পরিতোষ।

বেড়াতে যাবার কথায় মালতী যেন ছেলেমানুষ হ'য়ে গিয়েছিলো। ছোট্ট ঘরখানার চার চারটে দেয়াল যেন তার চোখ থেকে পলকে উধাও হয়ে গিয়েছিলো। রামধনু রঙের একটা আকাশ গ'ড়ে দিয়ে মাথার ওপরের ছাদটুকু যেন মুছে গিয়েছিলো নিঃশেষে। অজস্র কথাও বলেছিলো মালতী।

এখন চলন্ত ট্রেন, ট্রেনের শব্দ আর মালতীর দিকে তাকিয়ে সেই মুহূর্তটুকু মনের ভেতর আশ্চর্য একটা উত্তেজনা বুঝি ছড়িয়ে দিলো।

হঠাৎ মালতী বললো, 'কি হলো, কি ভাবছো ?'

'ভাবছি, কাল ভোরবেলা চারটেয় না ওঠাটা আমার কি রকম লাগবে।' সুভাষ বললো।

মালতী হাসলো। বললো, 'আমিও ভাবছি, ন'টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা তোমায় দেখতে কেমন লাগবে।'

কোন উত্তর না দিয়ে মালতীর চোখে চোখ রেখে সুখের মধ্যে নিঃশেষে ডুবে গেলো সুভাষ।

খুব কম ভাড়ায় চমৎকার একটা ঘর পেয়ে গেলো সুভাষ।

ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে আসতেই একটি লোক এসে দাঁড়িয়েছিলো সামনে। লোকটি যে ঘরের কথা বলবে, সেটা ভাবতেই পারে নি সুভাষ। তাই লোকটি 'ঘর চাই?' বলতেই খুশি হ'য়ে উঠেছিলো সুভাষ। একমুহূর্তও দেরী না ক'রে বলেছিলো, 'চাই। কিন্তু পছন্দমতো ঘর না হলে নেবো না।'

'চলুন আমার সঙ্গে। আপনার পছন্দ মতো ঘরই আপনাকে দেবো।' ব'লেই দাঁড়িয়ে থাকা একটা টাঙা ডেকে তাতে উঠে পড়েছিলো মালতী আর সুভাষকে নিয়ে। জিনিসপত্রগুলো টাঙাওয়ালাই তুলে দিয়েছিলো টাঙায়।

কেন জানি সুভাষের মনে হয়েছিলো লোকটির ওপর ভরসা করা যায়। আর সেজন্যেই কোন প্রশ্ন না ক'রে উঠে পড়েছিলো টাঙায়। মালতী একটু অস্বস্তিবোধ করেছিলো ঠিকই, কিন্তু মালতীকে ইশারায় বুঝিয়েছে, অস্বস্তিবোধ করবার কোন কারণই নেই।

সুভাষের মনে হওয়াটাই শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে। সত্যিই সুভাষ এরকম চমৎকার একটা ঘর হয়তো খুঁজে বের করতে পারতো না।

মালতী ঘর দেখে ভারি খুশি।

শোবার ঘর একটা। ছোট্ট একটা রান্না ঘর তার সঙ্গে। রান্নার জিনিসপত্রও আছে সেখানে। ঘরের সামনেই একটা টিউবওয়েল। জায়গাটা স্টেশন থেকেও খুব দূরে নয়। সামনের রাস্তার পাশে দোকানপাটও আছে অনেক।

মালতী চারদিক দেখে শুনে বললো, 'তাহলে সাতদিনই আমরা থাকছি এখানে।'

'তোমার মনের মতো ঘর যখন পেয়েছি, তখন থাকতেই হবে সাতদিন।' সুভাষ বললো।

আর কোন কথা না বলে জিনিসপত্রগুলো ঘরের ভেতর গুছিয়ে রাখবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো মালতী।

নিঃশব্দে বাইরের একফালি বারান্দায় এসে নতুন জায়গাটাকে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে অনুভব করতে থাকলো সুভাষ।

মালতীকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলা বেরিয়ে দরকারী কিছু জিনিসপত্র কিনে নিয়ে এলো সুভাষ।

ভারি ভালো লাগছে সুভাষের।

মালতী যেন নতুন একটা সংসার তৈরী ক'রে ফেলেছে এরই মধ্যে।

এই নতুন সংসার মালতীকে নিয়ে এই মুহূর্ত থেকেই বুঝি স্বপ্নের দিকে চলেছে।

আজ থেকেই তো মালতীর মুঠোয় খেলা করছে সুখ। সাত-সাতটা দিন মালতীর এই সংসারে সেই সুখ বুঝি মালতীকে ছাড়া চিনবেই না কাউকে।

এখানে সুভাষের ক্লান্ত বিপন্ন মুখ দেখবে না মালতী। সুভাষের জন্য অপেক্ষা ক'রে ক্লান্তও হবে না। মালতী এটুকুর জন্যে বুঝি সব কিছু দিয়ে দিতে পারে।

সত্যিই, সুভাষকে সারাদিন পরিশ্রম করতে হয়। ভোর চারটের বেরিয়ে ন'টা সোয়া ন'টায় ফেরে সুভাষ। তারপর অসম্ভব তাড়া-তাড়ি স্নান খাওয়া সেরে কারখানায় বেরিয়ে পড়ে। কারখানার সময়ের ঠিক নেই। সাতটা সাড়ে সাতটা—কোনদিন আটটা হ'য়ে যায় অফিস থেকে ফিরতে। অসহায় ভাবে অপেক্ষায় ব'সে থাকে মালতী।

এই অপেক্ষা যে মালতীকে কষ্ট দেয় সুভাষ তা জানে।

এখানে সাত সাতটা দিন এসব কিছু নেই।

সুভাষ তো ব'লেইছে ন'টার আগে ঘুম থেকে উঠবে না সুভাষ। মালতী কোন কারণেই সুভাষকে ডাকবে না ন'টার আগে। এটা তো মালতীর কাছে সুখের একটা খেলা।

এসব ভাবতে ভাবতে যেন অসম্ভব সুখী একটা মানুষ হ'য়ে উঠলো সুভাষ।

রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের বারান্দায় মালতীর সঙ্গে

খানিকটা সময় গল্প ক'রে ঘরে এলো সুভাষ। বিছানার ওপর চমৎকার একটা বেডকভার পেতে দিয়েছে মালতী। বেডকভারটা একটু সময় দেখে নিয়ে সুভাষ পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বিছানার ওপর আরাম ক'রে শুয়ে মালতীর দিকে ফিরলো।

তারপর মৃদুস্বরে বললো, 'আমায় কিন্তু কাল ন'টার আগে ডাকবে না মালতী।'

কাজ করতে করতেই ফিরে একবার সুভাষকে দেখে নিয়ে সুখ সুখ গলায় মালতী বললো, 'আচ্ছা।"

সুভাষ শু'য়ে শু'য়ে মালতীর কাজ দেখতে থাকলো নিবিড় চোখে।

রাতটা বুঝি সুখের সমুদ্রে তলিয়ে অথৈ হ'য়ে উঠেছিলো। মালতী আর সুভাষ তার তল খুঁজে পায়নি। 'ঘুমোবার মুহূর্তেও সুভাষ বলে-ছিলো, ন'টার আগে আমায় ডাকবে না মালতী।"

কিন্তু কি আশ্চর্য, হঠাৎ ঘরের ভেতরের একরাশ অন্ধকারে পরিপূর্ণ-ভাবে ঘুমটা ভেঙে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটা একবার দেখতে ইচ্ছে হলো সুভাষের।

বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের ক'রে টর্চে'র আলোয় ঘড়িটার ওপর চোখ রাখলো সুভাষ। চারটে বাজতে দশ।

না, এখন তো ঘুম ভাঙবার কথা ছিলো না সুভাষের। সুভাষ তো ন'টা পর্যন্ত নিঃসাড়ে ঘুমোবে।

পাশ ফিরে তাকালো সুভাষ। অন্ধকারেও ঠিক দেখলো, অঘোরে ঘুমোচ্ছে মালতী। মালতী নিশ্চয়ই সুখের স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে।

হাসলো সুভাষ। তারপর চোখ বুঁজে মনে মনে ঠিক করলো, ঠিক নটা পর্যন্তই সে ঘুমোবে।

কিন্তু চোখ বুঁজলেই কি ঘুম আসে? না, আসে না।

সুভাষের ঘুম আসছে না। ন'ড়ে চড়ে আরাম ক'রে শু'তে চেষ্টা করলো সুভাষ।

অন্যদিন হলে এমনি সময় সুভাষ সাইকেল নিয়ে রেডি। ঘুম ঘুম চোখে মালতী হাই তুলছে।

সাতদিন এসব কিছু নেই। সারাদিন ঘুমোলেও কেউ এসে ঘুম ভাঙাবে না।

এসব ভেবে ঘুমুতে চেষ্টা করলো সুভাষ।

কিন্তু না, ঘুম আসছে না কিছুতেই। তবু নানান ভাবে সুভাষ চেষ্টা করলো ঘুমুতে।

শেষ পর্যন্ত খানিকটা অসহায় ভাবেই উঠে পড়লো সুভাষ।

খাট থেকে নেমে দরজা খুলে বাইরের এক ফালি বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

ভোরবেলার হালকা অন্ধকারে ডুবে আছে চারদিক। জেগে ওঠা পাখি ডাকছে কাছে দূরে। ঠাণ্ডা একটা বাতাস ছুঁয়ে যাচ্ছে সুভাষের শরীর।

সুভাষ নিবিড়ভাবে ভাবতে চেষ্টা করলো প্রত্যেক দিনের ভোরই কি ঠিক এইভাবে এসে দাঁড়ায়? সুভাষ তো ভোরবেলাগুলোকে ঠিক ঠিক দেখতে পায় না। দেখতে পায় শুধু ভোরবেলাগুলোর কাজকে। ভোরবেলাগুলো আছে ব'লেই খবরের কাগজ দেবার কাজটা আছে' আর খবরের কাগজ দেবার কাজটা আছে ব'লে সংসার নিয়ে সে একবিন্দু স্বপ্ন দেখতে পারে। সুভাষ নিজের ভাবনার মধ্যে আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে থাকলো।

কতোক্ষণ সুভাষ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলো সুভাষ তা জানে না। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ছুঁয়ে দিতেই ফিরে দেখলো, মালতী হেসে বললো, 'কি হলো? ন'টা পর্যন্ত শু'য়ে থাকবে বলেছিলে না?'

হাসলো সুভাষ। আশ্চর্য একটা সুখে ভেসে যেতে যেতে বললো, 'পারা যায়?'

মালতী বললো, 'জানতাম, ন'টা পর্যন্ত তুমি শু'য়ে থাকতে পারবে না। তাই তোমায় তখন কিছু বলিনি। জানো, অমনি শু'য়ে শু'য়ে সুখ পাওয়াটাও অভ্যেস করতে হয়।'

কিন্তু সুখ যদি অভ্যেস হতো, তাহলে এই মুহূর্তে ভোরবেলার এই আশ্চর্য সুখটুকু কি পেতে পারতো সুভাষ? অভ্যেসের সুখ তো সুখ নয়। সে তো এক ঘেয়ে ক্লান্তিকর। সে সুখ মনকে নতুন কিছু

দেয় না, অভ্যেসের এক ঘেয়েমি দেয় শুধু।

এই মুহূর্তের সুখ তো সুভাষের অভ্যেসের সুখ নয়। এ সুখ সুভাষের প্রতিদিনের পরিশ্রমের ভেতর থেকে হঠাৎ ফুলের মতো ফুটে উঠেছে।

সুভাষের সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো আনন্দে।

সুভাষ আকাশের দিকে তাকালো একবার। তারপর মালতীর দিকে ফিরে বললো, 'চলো, বেরিয়ে পড়ি।'

'এখুনি? এই ভাবে?' মালতী অবাক হ'য়ে বললো।

সুভাষ বললো, 'হ্যাঁ, এখুনি এই ভাবেই।'

ব'লে একরকম জোর ক'রেই মালতীকে নিয়ে বাইরে এসে দরজা বন্ধ ক'রে ভোরের অন্ধকারে ঢাকা পথ ধ'রে হাঁটতে থাকলো সুভাষ।

কতো কাল পর আজ সুভাষ ভোরের অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কেবল নিজের জন্যে হেঁটে চলেছে।

সুভাষ আর কিছু ভাবতে পারছে না।

লিফ্‌টে সোজা ছ'তলায় উঠে এলো নন্দিনী। ছ'তলায় সুজয়ের অফিস। লিফ্‌ট থেকে নেমে এসে চোখ বাড়িয়ে সুজয়ের অফিসের দরজাটা দেখলো। তারপর সময় দেখলো হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে। নিশ্চয়ই এখন সুজয়কে তার টেবিলে পাওয়া যাবে। মনে মনে ভাবলো নন্দিনী। তারপর পা বাড়ালো সুজয়ের অফিসের দরজার দিকে।

সুজয়কে যে খবরটা জেনে আসতে বলেছে, সে খবরটা যতক্ষণ না পাচ্ছে, নিশ্চিন্ত হতে পারছে না নন্দিনী। কি করে নিশ্চিন্ত হবে।

ভাবতে ভাবতেই সুজয়ের অফিসের দরজা পেরিয়ে ভেতরে এলো নন্দিনী। সুজয় যে টেবিলে বসে, সে টেবিলের দিকে ফিরে দেখলো। সুজয় নেই। তার মানে সুজয় এখনও আসেনি।

ফের একবার ঘড়ি দেখলো নন্দিনী।

বাঁ পাশের টেবিলে সুজয়ের বন্ধু অসিত নন্দিনীকে হাতঘড়ি দেখতে দেখেই বললো, 'আপনি বসুন, সুজয় এক্ষুনি এসে পড়বে।'

অসিত জানে, মাঝে মাঝেই সুজয়ের কাছে আসে নন্দিনী।

নন্দিনী সুজয়ের টেবিলের সামনের চেয়ারে এসে বসলো। সুজয়ের জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। খবরটা না নিয়ে কিছুতেই যেতে পারবে না নন্দিনী।

নন্দিনীর অফিস চারতলায়। একটু দেরী করে অফিসে গেলে কিছু এসে যাবে না। সবাই জানে, ছেলেকে নিয়ে ক'দিন ধরেই ভারি অসুবিধেয় আছে নন্দিনী।

না, বেশীক্ষণ বসতে হলো না নন্দিনীকে। সুজয় এলো। মুখোমুখি বসলো নন্দিনীর। সুজয়ের কিছু বলবার আগেই অধৈর্য গলায় নন্দিনী বললো, 'খবর নিয়েছো ?'

সুজয় বললো, 'নিয়েছি।'

'কি বললো ওরা ? নন্দিনী প্রায় ঝুঁকে পড়লো সুজয়ের দিকে।

সুজয় নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে খানিকটা দুর্বল গলায় বললো, মাস দুয়েক পরে খবর নিতে বললো।

হতাশ গলায় নন্দিনী বললো, 'মাস দুয়েক! তার আগে কি

কিছু করা যাবে না।'

মাথা নাড়লো সুজয়। বললো, 'মাত্র তিরিশটা সিট ওদের। মাস দুয়েকের আগে একটাও খালি হচ্ছে না।'

'কি ক'রে আমি দু'মাস অপেক্ষা করি বলতো?' তেমনি হতাশ গলায় বললো নন্দিনী।

সিগারেটের প্যাকেটটা পকেট থেকে বের করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সুজয় বললো, 'তাছাড়া উপায় কি?

নন্দিনী বললো, 'অন্য কোনো ক্রেশের খবর তোমার কাছে নেই?'

'আছে। কিন্তু সেগুলো এই ক্রেশটার মতো নয়। তোমার ছেলের জন্যে আমি সেগুলোর কথা বলবো না। সুজয় বললো।

নন্দিনী চুপ করে রইলো।

সুজয় তার টেবিলের ওপর রাখা অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বললো, 'একটু কষ্ট করে দুটো মাস ছেলেটাকে রাখো তারপর তো আর ভাবতে হবে না।'

'তাই করতে হবে। উঠে পড়লো নন্দিনী, হাতঘড়ি দেখলো। আর বসবার সময় নেই। মস্ত বড়ো করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললো, 'চলি। পরে এ নিয়ে কথা বলবো।'

সুজয় বললো, 'আচ্ছা।'

নন্দিনী ফিরে পা বাড়ালো।

এসব ভাবনা দিলীপেরই করা উচিত।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষ দিলীপ। বিয়ের পর থেকে সব কিছু নন্দিনীর ওপর ছেড়ে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত। অফিস আর নাটক, এ দুটো বিষয় ছাড়া আর কিছু সে জানে না। নন্দিনীর যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্যে ফ্রিজ থেকে শুরু করে যা যা দরকার সবই কিনে দিয়েছে। ছেলেটার জন্য এবার যে একটা ক্রেশের প্রয়োজন, সে ভাবনাটাও তার নেই। দিলীপের মা, বাবা যদ্দিন এখানে ছিলেন; তদ্দিন ছেলেটাকে নিয়ে কোনো ভাবনাই ছিলো না নন্দিনীর। একবছরের তাতাই বলতে গেলে নন্দিনীর ধারে কাছে ঘেঁষতো না। অফিসে বেরোবার সময় এমনভাবে তার ঠাকুমার কোলে চেপে হাত নাড়াতো,

যেন নন্দিনী বাইরের কেউ। হাত নাড়াতে ভালো লাগে বলেই হাত নাড়ায়। দিলীপের সঙ্গে তার খাতির ছিলো খবরের কাগজ আসবার আগে পর্যন্ত। কারণ খবরের কাগজ এলে দিলীপের কাছে সবাই অচেনা।

দিলীপের মা বাবা বড়ো ছেলের কাছে দিল্লীতে চলে যেতেই সমস্যায় পড়েছে নন্দিনী। তাতাই কার কাছে থাকবে? তিনদিন ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকতে হয়েছে নন্দিনীকে। শেষ পর্যন্ত অনেক খুঁজে একটি কাজের মেয়েকে যোগাড় ক'রে বাড়িতে রেখেছে নন্দিনী। সে সারাদিন থাকে তাতাইয়ের সঙ্গে।

নন্দিনীরা ফিরলে চলে যায়। তাতাই যে তার কাছে একটুও ভালো থাকে না, তা ঠিক বুঝতে পারে নন্দিনী। তাতাইকে দেখেই তা বুঝতে পারে। ক' দিনেই বুঝি রোগা হয়ে গেছে তাতাই।

সারাদিন এরকম একজন মেয়ের কাছে তাতাই থাকবে, এটা কিছুতেই পছন্দ করতে পারছে না দিলীপ। এ দিয়ে নন্দিনীর সঙ্গে খানিকটা রাগারাগিও হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত ক্রেশের কথা বলেছে দিলীপ। ভালো কোনো ক্রেশে দিলে তাতাই অন্তত যত্নে থাকবে। দিলীপ এটুকু বলেই তার দায়িত্ব শেষ করেছে। একে ওকে ভালো একটা ক্রেশের খবর জিজ্ঞেস করতে করতেই সুজয়ের কাছে শেষ পর্যন্ত এই ক্রেশটার খবর পেয়েছে নন্দিনী। ক্রেশটা যেমন ভালো তেমনি অফিসে আসবার পথেই পড়ে। সুজয়েরও চেনা। কাজেই নন্দিনী আজ সুজয়ের কাছে ক্রেশের খবরটা পাবার জন্যে উত্তেজিত হয়েছিলো রীতিমতো।

কিন্তু আরো দু'মাস অপেক্ষা করতে হবে শুনে নন্দিনী মনে মনে ভারী অসহায় হয়ে পড়েছে। এই দু'মাস সেই কাজের মেয়েটির কাছেই রাখতে হবে তাতাইকে। দিলীপ রাগারাগি করবে, তাতাইয়ের শরীর আরো খারাপ হবে। সারাদিন অফিসে বসে অশান্তি ভোগ করবে নন্দিনী। কিন্তু দু'মাস অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় কি!

এ সব কথা ভাবতে ভাবতেই লিফ্‌টে চারতলায় নামলো নন্দিনী। তারপর, দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকলো নিজের অফিস ঘরের দিকে।

রাতে রিহার্সাল দিয়ে ফিরলো দিলীপ।

তাতাই ঘুমিয়ে পড়েছে অনেকক্ষণ। দিলীপের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে টি· ভি দেখছিলো নন্দিনী।

দিলীপ ঘরে এসে টি. ভি. তে কি হচ্ছে একবার দেখলো। তারপর ঘুমন্ত তাতাইকে একটুখানি আদর করে বললো, 'ক্রেশের ব্যবস্থা হয়ে গেছে?'

ম্লান চোখে দিলীপের দিকে ফিরলো নন্দিনী। বললো, 'আরো দু'মাস অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে সীট পাওয়া যাবে না।'

'আরো দু'মাস!' দিলীপ বুঝে অধৈর্য হলো।

নন্দিনী বললো, 'কি করা যাবে বলো! ভালো জায়গা ইচ্ছে করলেই তো পাওয়া যায় না।'

দিলীপ কোনো কথা বললো না। নন্দিনী বুঝতে পারলো দু'মাস অপেক্ষা করতে হবে শুনে মনে মনে বিধ্বস্ত হয়েছে দিলীপ। কিন্তু তার জন্য কি করতে পারে নন্দিনী। কোনো সুযোগ থাকলে সুজয় নিশ্চয়ই কাল থেকেই তাতাইকে ক্রেশে দেবার ব্যবস্থা করে ফেলতো।

দিলীপ পোশাক পাল্টাবার জন্য জামার বোতাম খুলছে।

নন্দিনী টিভিটা বন্ধ করে দিলো। রাত হয়েছে। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে এখুনি। মন ঠিক না থাকলে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তেই ইচ্ছে করে।

পোশাক পাল্টাতে পাল্টাতেই নন্দিনীর দিকে ফিরে দিলীপ বললো, তুমি কিছুদিন ছুটি নিয়ে নাও নন্দিনী।'

'হঠাৎ ছুটি নিতে বলছো কেন? নন্দিনী অবাক হয়ে বললো।

দিলীপ বললো, 'তাতাই তাহ'লে তোমার কাছে থাকতে পারবে।'

'কিন্তু দু'মাস ছুটি তো আমার পাওনা নেই।' নন্দিনী বললো।

দিলীপ কি যেন বলতে গিয়েও বললো না

নন্দিনী একটু সময় দিলীপের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তাছাড়া পাওনা থাকলেও অতো ছুটি অফিস এখন দেবে না।'

দিলীপ বুঝি বিপন্ন হলো খানিকটা। অন্যমনস্ক ভাবে নন্দিনীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'ওরকম ভাবে তাতাইকে রেখে যেতে আমার ভয় করে।'

নন্দিনী বুঝতে পারলো, দিলীপ মনে মনে ক্রেশের ব্যাপারটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে। ঘুমন্ত তাতাইকে একবার দেখলো। তারপর দিলীপের দিকে ফিরে বললো, 'নিশ্চিন্তে আমিও অফিস করতে পারছি না। কিন্তু তাতাইয়ের জন্যে ভালো একটা ক্রেশ না পেলে কি করবো বলো?'

দিলীপ কিছু বললো না।

একটু সময় নিঃশব্দে থেকে হঠাৎ ব্যস্তভাবে নন্দিনী বললো, 'যাকগে, চলো, অনেক রাত হয়েছে, খেয়ে শুয়ে পড়ি।'

বলেই নন্দিনী উঠে পড়লো। পা বাড়ালো রান্নাঘরের দিকে। সত্যিই নন্দিনীর এখন ঘুম পাচ্ছে।

পরদিন অফিসে এসেই সুজয়ের সঙ্গে ফের ক্রেশের ব্যাপার নিয়ে কথা বলে নিলো নন্দিনী। দু'মাস অপেক্ষা করতেই হবে। তাতাইয়ের জন্য সুজয় ক্রেশের একটা সীটের ব্যবস্থা করে দেবেই।

খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েই নিজের অফিসে এলো নন্দিনী। টেবিলে বসে কাজে মন দিতে চেষ্টা করলো।

তাতাইকে অমনিভাবে রেখে যেতে দিলীপের ভয় হয়। মনে মনে ভাবলো নন্দিনী। সত্যিই সেই কাজের মেয়েটি তো চাকরি করতে আসে। তার সম্পর্ক টাকার সঙ্গে। তাতাইকে কোনোরকমে সারাদিন রাখাটাই তার চাকরির সর্ত। তাতাইয়ের সুবিধে-অসুবিধে বোঝার দায় তার থাকবে কেন?

সারাজীবন তো আর তাতাইয়ের সঙ্গে থাকবে না সে। তার প্রয়োজন শেষ হলেই তাকে চলে যেতে হবে। তাতাই তাকে কখনও চিনে রাখবে না। রাখবার দরকারই বা কি?

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠলো নন্দিনী। কাজ থেকে মন সরে গেলো। বাড়িতে এখন তাতাই আর কাজের মেয়েটি। কি করছে ওরা? যা দুষ্টু তাতাই! মেয়েটি কি ভুলিয়ে ভালিয়ে ঠিক ঠিক রাখতে পারবে? আজ তো আসবার সময় তাতাই অস্থিরভাবে কান্নাকাটি করছিলো। এখনও কি তাতাই

কাঁদছে। কাঁদলে আর কি এসে যায় মেয়েটির? ওর তো একটাই কাজ। তাতাইয়ের সঙ্গে সারাদিন থাকা।

উঠে পড়লো নন্দিনী। অফিসের মস্ত জানালার সামনে দাঁড়ালো একবার। কলকাতার ব্যস্ত ছবি দেখলো। মনের ভেতর থেকে অস্থিরতাটুকু মুছে ফেলতে চাইলো। তু'মাসে এমন কিছু হবে না। ক্রেশে দিতে পারলেই তো সুস্থভাবে, সুন্দরভাবে তাতাই সারাটা দিন কাটাতে পারবে। ভাবলো নন্দিনী। পায়ে পায়ে ফের নিজের চেয়ারে এসে বসলো। টেবিলের ওপর খোলা ফাইলের ওপর চোখ রাখলো।

সত্যিই, অফিসে শান্তিতে কাজ করতে পারে না নন্দিনী। ঘড়ির কাঁটা যেন পাঁচটাকে ছুঁতেই চায় না। দিলীপের মা বাবা কেন যে দিল্লীতে চলে গেলেন।

কাল রাতে দিলীপের বলা কথাটাই বুঝি নন্দিনীকে আজ খুব বেশী করে অস্থির করে তুলেছে। কাজের মেয়েটার কাছে ওভাবে তাতাইকে রেখে যেতে ভয় হয় দিলীপের। কেন ভয় হয়? যদি হঠাৎ কিছু হয়ে যায় তাতাইয়ের? জ্বর আসে? যদি তুষ্টুমি করতে গিয়ে পড়ে যায়? যদি লেগে টেগে যায় কোথাও? ভেতরটা যেন কেমন করে উঠলো নন্দিনীর।

সত্যি এভাবে আর নন্দিনী পারছে না।

শেষ পর্যন্ত ছুটোর সময় অফিস ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো নন্দিনী। লিফট থেকে নেমে বাইরে এসে দাঁড়াতেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলো।

ড্রাইভারকে ঠিকানা বলে সামনের কাঁচের মধ্য দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রাস্তা ফুরোতে থাকলো নন্দিনী।

মনে মনে নন্দিনী ঠিক করে ফেলেছে ছুটি নেবে কয়েকটা দিন। নিয়ে পছন্দ মতো ক্রেশ খুঁজে বের করবে। এই তু'মাস তাতাইকে সেখানে রাখবার ব্যবস্থা করবে। সুজয়কে কিচ্ছু জানাবে না।

তু' মাস পর যখন ক্রেশের খবর দেবে, তখন সেখানে নিয়ে যাবে তাতাইকে। এভাবে আর অফিস করতে পারবে না নন্দিনী।

এমনি নানান কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো ট্যাক্সি।

নন্দিনী বাড়ির দিকে তাকালো। দুপুরের নির্জনতা ঘিরে আছে বাড়িটা।

ভাড়া মিটিয়ে বাড়ির দরজায় এলো নন্দিনী। দরজার পাশের জানালাটা খোলা। কি মনে হলো জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখ রাখলো ভেতরে।

খাটে শুয়ে বোধহয় ঘুমুচ্ছে তাতাই। খাটের নীচে বসে একটা হাত পাখা নিয়ে তাকে হাওয়া করছে মেয়েটি। তার চোখেও ঘুম। কিন্তু হাত পাখাটা ঠিক দুলে যাচ্ছে। ফ্যানের দিকে তাকালো নন্দিনী। বুঝতে পারলো লোডশেডিং এর জন্য ফ্যান চলছে না। তাই হাত-পাখা দিয়ে তাতাইকে হাওয়া দিচ্ছে মেয়েটি।

বাড়িতে তো হাত পাখা নেই! তাহ'লে নিশ্চয়ই তাতাইয়ের জন্য মেয়েটি জোগাড় করে এনেছে হাত পাখাটা। ঘুমের মধ্যেও যাতে গরমে কষ্ট না পায় তাতাই, তার জন্য সে হাতপাখা দোলানো থামায়নি।

নন্দিনীর সমস্ত শরীর স্নিগ্ধ এক অনুভবে ডুবে গেলো। আঁচল দিয়ে কপালের ঘামটুকু মুছলো নন্দিনী। মস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস উঠে এলো বুকের গভীর থেকে।

না, নন্দিনী এখন আর দরজার কড়া নাড়াবে না। ডাকবেও না মেয়েটিকে। এখন নিঃশব্দে এখান থেকে ফিরে যাওয়াই তার উচিত।

সত্যিই, কি দারুণ নিশ্চিন্তে যে ঘুমিয়ে আছে তাতাই!

ভালো করে একবার তাতাইয়ের মুখ দেখলো নন্দিনী। তারপর ফিরে হাঁটতে থাকলো।

নন্দিনী এখন অফিসে ফিরবে। ছ'তলায় উঠতে হবে প্রথমে। সুজয়কে বলতে হবে, ক্রেশের খবর নেবার আর দরকার নেই। তারপর নামবে চারতলায়, অফিসে। অনেক কাজ টেবিলে জমে আছে।

নন্দিনী একটা টাক্সি ধরবার জন্য দ্রুত হাঁটতে শুরু করলো।

———